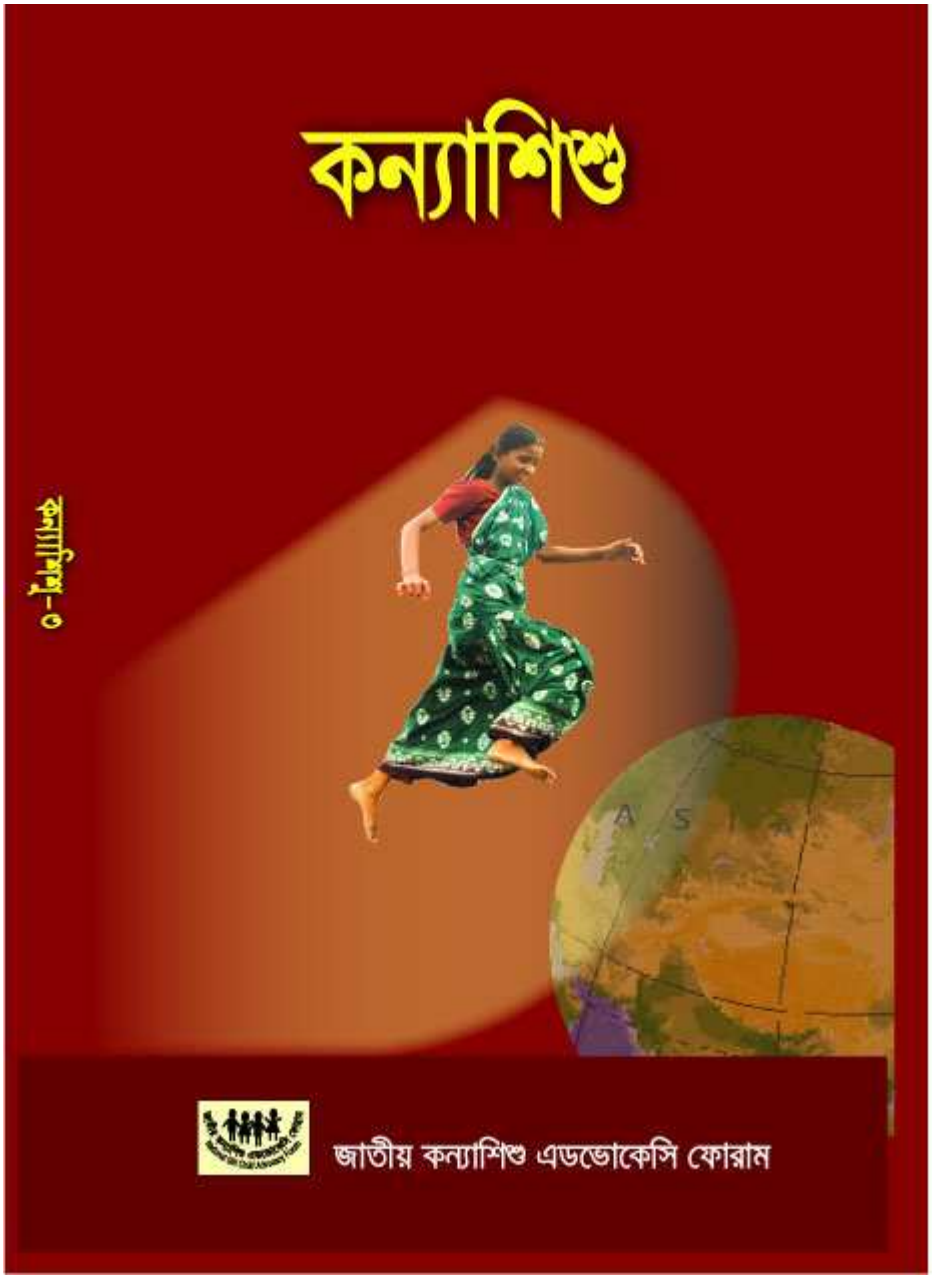

সম্পাদকীয়_____

বিশ্বের দরিদ্রতম জাতি কন্যাজাতি। বিশ্বজুড়েই কন্যাশিশুরা দারিদ্র্যের সাথে জড়িত যত প্রকারের অন্ধকার, বহুমুখী বঞ্চনা, বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতন, অপমান ও অপমৃত্যু প্রভৃতির শিকার। এসব রূঢ় অবর্ণনীয় বিষয়গুলো কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য। বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই বাস্তবতা আরো রূঢ় আরো করুণ।

দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় তিন কোটি কন্যাশিশু। লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম, বিবাহ, সামাজিক মর্যাদা, নিরাপত্তাসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তে এই বিশাল জনগোষ্ঠী নানারকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। ফলে পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা, পারিবারিক নির্যাতন এবং বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে একটি পুষ্টিহীন কন্যাশিশু কিশোরী অবস্থায় আর একটি পুষ্টিহীন কন্যাশিশুর জন্ম দিচ্ছে। এভাবে আমরা অপুষ্টির দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছি। অন্যদিকে এই পুষ্টিহীন কন্যাশিশু জন্ম দিয়ে যাবতীয় দায়ভার কাঁধে নিয়ে নানা প্রকার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে 'মা' কন্যাশিশুটি। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে নারীদের গড় বিবাহের বয়স ১৬ দশমিক ৯ বছর। বিবাহিত এই নারীদের ৬০ ভাগ ১৯ বছর বয়সের পূর্বেই প্রথম সন্তানের মা হয়। অপরিণত বয়সে গর্ভ ধারণ এবং প্রসব করা এ সকল শিশুর প্রায় ৮০ ভাগ অপুষ্ট, যার একটি বড় অংশ অকালেই ঝরে পড়ে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বেশ কিছু অনুচ্ছেদে কন্যাশিশুর অধিকার ও তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে অনুচ্ছেদ ১০-এ জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ, ১১-তে মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা, ১৫-তে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা,

১৭-তে বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান, ১৯-এ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, ২৭-এ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ২৮-এ নারী-পুরুষ ভেদে বৈষম্য না করা ও নারী-পুরুষের সমানাধিকার (বিনোদন ও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রেও) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এমনকি অনুচ্ছেদ ২৮/৪-এ বলা হয়েছে, 'নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।'

সংবিধানের এ সকল অনুচ্ছেদ ও বাস্তবতার মধ্যে অনেক ফারাক রয়েছে। সংবিধানে শিশু ও নারীদের এগিয়ে নেয়ার যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে বাস্তবে কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষেত্রে ঘটছে এর উল্টো। তারা ব্যাপকভাবে বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। কন্যাশিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অবসান ঘটাতে হবে। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ, সমাজের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশকে বঞ্চিত রেখে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজের সৌন্দর্য বিকাশে নারী-পুরুষ সকলের অংশগ্রহণ একান্ত জরুরি। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে আরো বেশি জরুরি। কেননা, একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে কেবলমাত্র তিনি নিজেই শিক্ষিত হন, অন্যদিকে একজন মহিলা শিক্ষিত হলে গোটা পরিবার শিক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এখন সোচ্চার। তারা শুধু কন্যাশিশু দিবস পালন নয়, সারা বছর কন্যাশিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'। প্রতি বছর সরকারি ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবটি পালন করে আসছে। দিবসটি উপলক্ষে ফোরামের আয়োজনে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কণ ও রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, র‍্যালি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র ও নিজস্বভাবে 'কন্যাশিশু' শিরোনামে একটি বিশেষ সংকলন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০০৭' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফোরামের উদ্যোগে 'কন্যাশিশু - ৩' সংকলনটি প্রকাশিত হল। সংকলনে মোট পঁচিশটি নিবন্ধ রয়েছে। পূর্বের ন্যায় এবারও নিবন্ধসমূহ লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে।

সংকলনটির জন্য নিবন্ধ সংগ্রহ, কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ-রিডিং, সংযোজন, সংশোধন, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের সদস্য ও কার্য-নির্বাহি কমিটির তালিকা প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সাথে সার্বিকভাবে জড়িত ছিলেন শাকিলা রুমা, মুনিরা সুলতানা মিতু এবং রোকসানা কনা। কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় যেসকল লেখক তাদের মূল্যবান নিবন্ধ পাঠিয়ে সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। এরূপ একটি সংকলন সম্পাদনায় সীমাবদ্ধতা, অসুবিধা ও ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। এ সংকলনটিও এর ব্যতিক্রম নয়। ভুল-ত্রুটি ও মুদ্রণপ্রমাদ থাকলে সহৃদয় পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০০৭

বুড়াবুড়ি জনপদের তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীরা

অদিতি ফাল্গুনী*

"বাসর রাইতে হামার স্বামী পালায় গেছে। হামার তো যৌতুক নাই বইলা স্বামী নিয়া না যায়। স্বামীর মুখ দেখি নাই, স্বামীর হাতে একবার পানও খাই নাই।" এই আক্ষেপ আর্জিনা নামে কুড়িগ্রামের বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের এক মহিলা দিনমজুরের (বয়স:৩৮)। ষোড়শী আর্জিনার পিতা তার স্বামীকে যৌতুক দিতে পারেন নি বলে বর বিয়ের রাতেই সকল দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে পালিয়েছিল এবং সারা জীবনেও আর ফিরে আসে নি। একবার বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়ে হিসেবে আর্জিনার আর দ্বিতীয় বিয়ে হয় নি। বাকি জীবনটা তার কাটছে কখনো রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করে, আবার কখনো কৃষি জমিতে দিনমজুরের কাজ করে। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই আর্জিনা এখন কিছুটা মানসিক বিভ্রমগ্রস্থ।

উত্তর বাংলার কুড়িগ্রাম জেলার বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন একটি অদ্ভুত জনপদ। এখানকার সাতভিটা ভেল্লিপাড়া গ্রামে প্রায় ষোল/সতের জন কিশোরী আছে যাদের বিয়ে হয়েছে বারো হতে পনেরো বছর বয়স সীমার মধ্যে। ষোল হতে উনিশ বছর বয়সে তারা সন্তানসহ কিংবা নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে পুনরায় ফিরে এসেছে বাবার বাড়িতে। শুধু সাতভিটা ভেল্লিপাড়া নয়, আশেপাশের চার/পাঁচটি গ্রামসহ গোটা তল্লাটেই এমন স্বামী পরিত্যক্ত বা তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীর সংখ্যা একশ'

*

ছাড়িয়েছে। বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মানুষদের বিশ্বাস, বারো হতে পনেরো বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে না হলে তাদের কুমটা (কুমারী) অপবাদ থেকে যায়। যা মেয়েটির পরিবারের জন্য চূড়ান্ত অপমানজনক এবং কোন মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তার অতৃপ্ত আত্মা প্রেত হয়ে জনপদে ঘুরে বেড়ায়। অবিবাহিত মেয়েদের প্রেতাত্মা মানুষকে ভয় দেখায়। যদিও বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের অভিভাবকগণ জানেন যে, তাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার ছ'মাস হতে সর্বোচ্চ দু/তিন বছরের ব্যবধানে তারা পুনরায় বাবার বাড়ি ফিরে আসবে কোলে বাড়তি এক/দুটো সন্তান নিয়ে, তবুও কুমটা অপবাদ তো ঘুচবে। আর এই অপবাদ ঘোচার জন্য কিশোরী মেয়েটির শিক্ষা জীবন শেষ হয়ে যাক, অকাল মাতৃত্বে শরীর ভেঙ্গে পড়ুক, যৌতুক না দিতে পারার অপরাধে শ্বশুর বাড়িতে সে দৈহিক-মানসিক-পুষ্টিগতভাবে নিগৃহীত হোক– তবুও তো মেয়ের জীবনে একবার হলেও বিয়ে হয়েছে। ২০০৭ সালেও বাংলাদেশের কোন কোন জনপদে এমন বাস্তবতার বিদ্যমানতা আমাদের অবাক করলেও তা মিথ্যে হয়ে যায় না!

"বয়স যতি হবি, মেয়ের ততি খারাপ হবি। ছুটকা বয়সে যৌতুকের জন্য কম পঁয়সা নাগে। হামাদের জমি নদী ভাঙ্গি নিয়ে গেইছে। দু'টা ভাই ছোট। ক্লাস সিক্সে থাকতে হামার বিয়া হইছে। বিয়ার মোহরানা কত বান্দিছলো তা হামি জানি না। স্বামী পরে হামাক তালাক দিছে"– ষোড়শী শিউলি বললো। তার বিয়ে হয়েছিল আরো দুই বছর আগে। বিয়ের এক বছর যেতে না যেতে যৌতুক দিতে না পারার অপরাধে সে আজ তালাকপ্রাপ্ত।

"হামার বিয়া হইছে ১৩ বছর আগে এক পাগলার সাথিত। তিন বছর পর তালাক হইল। দুই বছরের ছইল কোলে। সেই ছইলের বয়স এখন দশ"– জানালেন পঁচিশ বছরের রোকসানা।

তিন কন্যা সন্তানের জননী মোসলেহা কৈশোরেই তার তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার সময় যৌতুক প্রদান প্রসঙ্গে বলেন, "কাকেও দশ হাজার, কাকেও পাঁচ হাজার টাকা দিছি। জামাইরা চাষাড়ি কাম (কৃষিকাজ) করে। তাই টাকা কম নাগে।"

গত ২৭ এপ্রিল স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) ও একশন এইড বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে 'কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুবিধা সৃষ্টি' থিমের কার্যক্রমের লক্ষ্যে উত্তর বাংলার কুড়িগ্রামের বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের সাতভিটা ভেল্লিপাড়া গ্রামে তালাকপ্রাপ্তা ষোল/সতেরো জন কিশোরী এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে সেখানকার অভাব, অভাবের দরুণ বাবা-মায়েদের কন্যা সন্তানকে দ্রুত বিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, যৌতুকের কারণে অধিকাংশ বিয়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তালাকে রূপ লাভ, মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের উপ-বৃত্তিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও সামাজিক পশ্চাৎপদতার কারণে এই ইতিবাচক কার্যক্রমের ব্যর্থতা এবং নারী স্বাস্থ্যের ভয়াবহ চিত্রসহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে। গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রের স্বেচ্ছসেবী কুলসুমের বাসাতে আমরা মিলিত হয়েছিলাম সাতভিটা ভেল্লিপাড়া গ্রামের তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীদের সঙ্গে। স্বেচ্ছাসেবী কুলসুম (বয়স আনুমানিক ২২/২৩) এই গ্রামের একমাত্র "বয়স্কা অবিবাহিত" মেয়ে। তাকেও তার ভূমিহীন মুদি দোকানদার পিতা বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কৈশোরেই। যৌতুক এড়াতে এক বিবাহিত ব্যক্তির সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার। প্রতিবাদী কুলসুম বলেন, পরিবারের সম্মান বাঁচাতে আমি একটি শর্তে বিয়েতে সম্মত হয়েছিলাম। শর্তটি ছিল, বিয়ের পর মুহূর্তেই স্বামী আমাকে তালাক দিবেন। পাত্র শর্তে রাজী না হওয়ায় আমার বাবা ও মামাতো ভাই আমাকে ব্যাপক মারধর করে, তবে শেষ পর্যন্ত আমি বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করার হাত হতে বেঁচে যাই।" এসএসসি ও এইচএসসি পাশের পর কুলসুম এখন কাজ করছেন গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। কুলসুমের ছোট বোন রীনাকে (বর্তমান বয়স ১৯) বিয়ে দেওয়ার সময় কুলসুম প্রতিবাদ করলেও বিয়ে বন্ধ করতে পারেন নি। কিন্তু বিয়ের এক বছর অতিক্রম করার পূর্বেই বিশ হাজার টাকা যৌতুক পরিশোধ করতে না পারার অপরাধে সাড়ে সাত মাস অন্তসত্ত্বা অবস্থায় বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হয় রীনাকে। কুলসুমের বাবা-মা এখন তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং নিজেদের বাড়ির একটি অংশ তারা ছেড়ে দিয়েছেন তাদের ছোট মেয়ে রীনার মতো আরো অনেক তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীর স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে জিইউকে পরিচালিত সেলাই কেন্দ্র স্থাপনের জন্য।

এখানে কথা হয় বহু তালাক প্রাপ্ত কিশোরীর সঙ্গে, তাদের মধ্যে আঞ্জু (বয়স: ১৯), জ্যোৎস্না (বয়স: ১৯) শিউলি (বয়স: ১৬) মর্জিনা (বয়স: ১৫), সুফিয়া (বয়স: ১৫) রেণু (বয়স: ১৬) প্রমুখের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আঞ্জু ও তার ছোট বোন রেণু দু'জনেই তালাকপ্রাপ্ত। দু'জনেই নিঃসন্তান। তাদের অন্য দুই বোন অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করে এখনো স্বামীর ঘর করছে। যে কোন মুহূর্তে সংসার ভেঙ্গে যেতে পারে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রীনার স্বামী তাকে অন্তসত্ত্বা অবস্থায় তালাক দিয়েছে। যদিও রীনার বড় বোন কুলসুম চাকরির টাকা জমিয়ে ছোট বোনের স্বামীকে দশ হাজার টাকা ও একটি বাই সাইকেল কিনে দিয়েছিল। তারপরও সংসার টেকে নি। রীনার ছেলের বয়স এখন সাড়ে চার বছর। তার স্বামী হুমকি দিচ্ছে যে, সাত বছর বয়স হলে সে আদালতে অভিভাবকত্বের মামলা দিয়ে ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে যাবে। যদিও এতদিন পর্যন্ত সে ছেলের ভরণপোষণে একটি পয়সাও ব্যয় করে নি। যে বিষয়টি আরো দুর্ভাগ্যজনক তা হচ্ছে, এই তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীদের একজনও তাদের স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহরের প্রাপ্য টাকা আদায় করতে পারেন নি।

যদি যৌতুক দিতে না পারার কারণে স্বামী কর্তৃক বিয়ের পর পরই তালাক দেওয়াটা একটি অমোঘ নিয়তি হয়ে থাকে, তবে এখানকার অভিভাবকরা সবকিছুর পরও অনেক কষ্টে অর্জিত সঞ্চয়ের টাকা ব্যয় করে কিশোরী মেয়েদের বিয়ে দিতে হন্যে হয়ে ওঠেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে মায়েরা জানান, সব ভাগ্যের লিখন। কতিগুলার (কিছু কিছু মেয়ের) সংসার হয় আবার কতিগুলার সংসার হয় না। যৌতুক শোধ দিবার পারলে সংসার হয় এবং সুখেই খাবার দেয় (যৌতুক দিতে পারলে সংসার টিকে এবং সুখেই খেতে পারে)। আর যৌতুক দিবার না পারলে তালাক হয়য়া যায়, তালাক না হলেও অত্যাচার হয়।

নদী ভাঙ্গন হামাদের ফকির করিছে। তাই মেয়েদের যৌতুক শোধ দিবার না পারি। কথায় কয়, বেটিছেলের কপাল আর বান্দোরের কপাল সমান। বেটাছেলের জন্ম মানে বাপ-মা'র পঞ্চাশ হাজার টাকার ডিপিএস- কিশোরী মেয়েদের মায়েরা একথা বলেন।

"শুনি যে যৌতুক না দেবার জন্য সরকারে আইন করিছে। কিন্তু, কুর্টে পাঁচ হাজার টাকা না দেলে কাঁই আমাকে কি দেবে? ঝগড়া করে কাঁই কুটি যাব? কুর্টে ওমরা (ছেলে পক্ষ) আগোত কাজ দিয়া পাঠাইছে। কেসের মইধ্যে খরচা করার পারো নাই!" বলেন তালাকপ্রাপ্ত আছিয়া (বয়সঃ ২০)। "খালেদা জিয়ার সাথে কুর্টের লোকদের কানেকশান আছে। যৌতুকের টাকার ভাগ সে পায়," সবার হাসির ভেতর গভীর সন্দেহের সাথে জানালেন দিনমজুর আর্জিনা বেগম, যার উদ্ধৃতি দিয়েই এই প্রতিবেদনের শুরু।

শুধুমাত্র যৌতুকের জন্য এত তালাকের সংখ্যায় আমাদের বিস্ময় প্রকাশ করাতে স্থানীয় নারীরা আরো বোঝালেন, বিয়ার পর মায়েদের বাচ্চা হয়, চেহারা নষ্ট হয়, ছেলে তখন সুন্দর আর কমবয়স, আবিয়াতো বা কুমটা আর ফুল পাত্রী খোঁজে। চমৎকার পিতৃতান্ত্রিক সমাজ! যে সমাজ একটি মেয়ের বয়স বারো হতে না হতে তার বিয়ের জন্য অস্থির হয়, চরিত্র নষ্ট হতে পারার ভয় দেখিয়ে 'কুমটা' বা কুমারীত্বের অপবাদের ভয়ে মেয়েটির জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিল, সেই একই সমাজ বছর না ঘুরতে মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হলে তাকে অসুন্দর, বিবাহিত, গর্ভবতী প্রভৃতি আখ্যা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটিকে দ্বিতীয় বিয়ের সুযোগ করে দেয়। সমাজে কেউ সেটিকে বিশেষ দোষও মনে করে না! কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার বিয়ের সুযোগও কমে আসে, কারণ সে আর কোনোক্রমেই ফুল পাত্রী বা পূর্ণ পাত্রী নয়।

"ভাত কে আর দেবে? স্বামী না দিবে, বাপ কি ভাই-বেরাদার না দিবে। নিজেই কর্ম করি খাওন লাগবে," গ্রামের মা-মেয়েদের এই সংলাপের মুখে আমরা যখন বলি যে নিজেই কর্ম করি খাওন যখন লাগবে, তখন কিশোরী মেয়েদের এত দ্রুত বিয়ে না দিলেই কি নয়? জবাবে তারা বলেন, "বিয়া মানে গণ্ডগোল, বিয়া মানে তালাক আর অপবাদ! একবারই না ঠগি! মেয়ের বয়স বেশি হলে যৌতুক বেশি নাগে যে! কোনো চ্যাংড়ার সাথে ভাব-ভালোবাসা হইলে আলাদা,"– বলেন উনচল্লিশ বছরের মা জ্যোতিনা। সোজা বাংলায় জীবনে একবার যেহেতু বিয়ে নামক গণ্ডগোল হতেই হবে, না হলে সমাজে খুব অসম্মান, কাজেই আগে আগেই সেটি করে ফেলা ভালো।

কুড়িগ্রামের বুড়াবুড়ি নামক এই ইউনিয়নের মূল সমস্যা অভাব। বুড়াবুড়ি ও তার সংলগ্ন অন্যান্য জনপদ যেমন পুরান ও নতুন অনন্তপুর, কাসির হাট, বেগমগঞ্জ, উলিপুর এবং চিলমারীসহ আশপাশের সব এলাকার মানুষই মূলত ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও ধরলাসহ বিভিন্ন নদী ভাঙ্গনের শিকার। নদী ভাঙ্গনের শিকার এই মানুষরা সরকারি উপবৃত্তির টাকা সত্ত্বেও মেয়ে সন্তানদের মাধ্যমিক স্তরে পড়াতে পারে না।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) তাদেরকে নিয়ে কাজ করছে, জিইউক-এর কর্মী এনামুল করিম জানালেন, এই যে ১৬/১৭টি মেয়েকে নিয়ে আমরা এখানে কাজ করছি, তা নিয়েও গ্রামবাসী প্রচুর বাজে কথা বলে। আমাদের খ্রিষ্টান বলে একঘরে করে রাখারও চেষ্টা আছে কারো কারো। আমি নিজে পুরুষ মানুষ, আবার বয়স বেশি নয়। এ নিয়েও কথা হয়েছে। গত দু/তিন বছর খুব কষ্ট করে চারিত্রিক সুনাম অর্জন করতে হয়েছে।

উলিপুর উপজেলার ব্র্যাক অফিসের লিগ্যাল এইড সেলের এক কর্মকর্তা জানালেন আরো ভয়াবহ তথ্য, তিনি বলেন, এখানে বহু ধু-ধু চরাঞ্চল আছে। যেমন, কলাকাটার চর, বেল্লিপাড়া, দুর্গাপুর ইত্যাদি। সেখানে উড়ন্ত বিয়ে বা ফ্লাইং ম্যারেজ ঘটে প্রায়ই। হয়তো অন্য কোন চর হতে অচেনা কোন মানুষ এসেছে কিষাণ খাটতে, বাবা মা জানে যে এই ছেলে আর কখনো ফিরবে না তবু তার কাছেই কম টাকায় দিতে পারবে বলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের ছ'মাস হতে এক বছরের মাথায় নতুন বর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বড় বড় শহরে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসে না!"

বিভিন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে জানা গেল যে, মেয়েরা একটু বড় হতে শুরু করলেই বিয়ে হয়ে যায় বলে এখানে মেয়েদের শিক্ষা জীবন খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। তালাক হওয়ার পর বুড়া ছাত্রী বলে শিক্ষা জীবনেও আর ফিরে আসা যায় না। এরূপ একটি তালাকপ্রাপ্ত কিশোরী সুরাইয়া বাবার অমতে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এসএসসি, এইচএসসি এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ হতে ডাক্তারি পাশ করেছেন। বর্তমানে তিনি রংপুরে কর্মরত। তবে, এমন সঙ্কল্প ক'জনের আর থাকে!

সমগ্র এলাকায় নারী স্বাস্থ্যের হালও খুব খারাপ। উলিপুর বা চিলমারী উপজেলা সদরে যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আছে তা এই গ্রাম থেকে প্রায় ২০ হতে ২৮ কিলোমিটার দূরে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাতভিটা ভেল্লিপাড়া গ্রামের এক মাইলের মধ্যে যে কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক ছিল তাও বিগত বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। এই গ্রামে ধাত্রী থাকলেও শরিয়ত শাসিত মুসলিম সমাজে ধাত্রীরা নোংরা কাজ করে বলে মনে করা হয়– জানালেন কুলসুম।

সাম্প্রতিককালে গ্রামের মহিলারা অবশ্য বের হয়ে আসতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ স্থানীয় বিভিন্ন সমিতিতে কাজ করছেন। নতুন জীবনের আশা ও চির পরিচিত আশঙ্কার সংমিশ্রিত সুর প্রকাশ পায় তাদের কণ্ঠে, "স্বামী দাম দেবার নাগিছে। সমিতির লোনে ছাগল কিনছি। স্বামী ছাগল দুধ দেবা খাইলং। বেচাইলং। জমি নিমু। আবাদ করমু। আমরা কি পত্তন করিবার পায়? জায়গা কিনতি ম্যালা টাকা লাগে (সমিতির দেওয়া টাকায় আমি ছাগল কিনেছি। ছাগল দুধ দিলে স্বামী সেটি খেয়েছে, ছাগল বিক্রয়ও করেছে। তাই আজকাল আমাকে দাম দিচ্ছে। জমি কিনবো। আবাদ করবো। কিন্তু, আমরা কি আসলেই পারবো? জায়গা কিনতে অনেক টাকা লাগে) !"

কুড়িগ্রামের বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের কিশোরী ও তালাকপ্রাপ্ত মেয়েদের এই সমস্যাটি প্রথম চোখে পড়ে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা একশন এইড বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতে আসা বিদেশী উন্নয়নকর্মী দিভান্না দ্যু লা পুয়েন্তের। সাতভিটা ভেল্লিপাড়া ও পার্শ্ববর্তী আরো তিনটি গ্রামের শতাধিক তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীদের (যাদের অনেকেই অপ্রাপ্তবয়স্ক মা) দেখে দিভান্না তার দেশের সরকার হতে প্রাপ্ত বৃত্তির পুরো টাকাটি দিয়ে যান যেন এই কিশোরীদের বিকল্প জীবিকার জন্য কিছু করা সম্ভব হয়। একশন এইড বাংলাদেশের সহায়তায় স্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র (জিইউকে) এখানে একটি সেলাই কেন্দ্র স্থাপন করেছে। গত ২৭ শে এপ্রিল সকালে আমরা যখন এই সেলাই কেন্দ্রে যাই, সেখানে তখন তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীরা 'হাতে বুনানো' নামে একটি সংস্থা হতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের লোগো তৈরির একটি ওয়ার্ক অর্ডারের কাজ করছিল।

"আমাদের এই কেন্দ্র এখনো আয় করবার মতো পর্যায়ে যায় নি। পেটিকোট ও ব্লাউজ সেলাই করার মাধ্যমে কিছু অর্থ উপার্জিত হলেও কিশোরী মেয়েরা নিজের হাত খরচ চালানোর মতো টাকা এখনো হাতে পাচ্ছে না।" বললেন স্বেচ্ছাসেবী কুলসুম। মোবাইল বুথ স্থাপন, মোমবাতি তৈরি, কাগজের ব্যাগ প্রস্তুত, চায়ের স্টল বা মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা, তালাকপ্রাপ্ত কিশোরীদের ক্যামেরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া প্রভৃতি বিকল্প উপায়ে সম্মিলিতভাবে তারা যেনো জীবিকা উপার্জন করতে পারে, সে বিষয়েও আলাপ হলো।

বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মতো বাংলাদেশের বহু দুর্গম জনপদের নারী সমাজ এরূপ হাজারো সমস্যায় বন্দী। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃত্ব, প্রশাসক এবং নীতি প্রণেতারা একটু কি দৃষ্টি ফেরাবেন?

চরের শিশুবধূরা কুড়িতেই বুড়ি

ড. আতিউর রহমান*

মূল ভূখণ্ডের চেয়ে চরের মানুষ অনেক বেশি কষ্টে কোনো মতে বেঁচে আছেন। বিচ্ছিন্ন দ্বীপচরে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও খারাপ। সারাদেশে যেখানে হতদরিদ্র পরিবারের সংখ্যা মোট পরিবারের পনেরো শতাংশ, এসকল চরে সেই হার ৪৫ শতাংশ। তার মানে চরে হত দারিদ্র্যের মাত্রা মূল ভূখণ্ডের তিণগুণ। আর এই হতদরিদ্র পরিবারগুলোতে নারীর দুঃখ ও বঞ্চনা আরও প্রবল। মনেই হয় না তারাও মানুষ। আসলেই চরাঞ্চলের নারীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। সীমাহীন দারিদ্র্য, অবহেলা, অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব তাদের জীবনকে দিন দিন করেছে দুর্বিষহ। নারী হিসেবে তেমন কোনো অধিকারই তারা পাচ্ছেন না। স্বাভাবিকভাবে বাল্যবিবাহ নিয়ে আজকের বাংলাদেশে সচেতনতার অভাব তেমন নেই বলা হলেও চরের নারীদের ক্ষেত্রে তা কিন্তু ভিন্ন। মূল ভূখণ্ডে মানুষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন চরের এই মানুষদের মনমানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সম্প্রতি আমরা চরের মানুষের ওপর একটি গবেষণা শুরু করেছি। 'নদী ও জীবন' শিরোণামের

* চেয়ারম্যান, সমুন্নয়

গবেষণা থেকে যে সকল তথ্য বের হয়ে এসছে তা সত্যি ভয়ঙ্কর। আমাদের এই গবেষণার পাশাপাশি সংবাদপত্রের পাতাতেও চর জীবনের দুঃখ ফুটে উঠছে। ক'দিন আগে দৈনিক মানবজমিনে চরের দুঃখী শিশু-বধূদের ওপর একটি হৃদয় বিদারক প্রতিবেদন সিরিজ হয়েছে। অসহায়, অধিকারহীন নারী শিশুদের বুদ্ধি বিবেচনা হবার আগেই যেভাবে বিয়ে দেয়া হয় তা যে কত অমানবিক – তা এই সিরিজ প্রতিবেদনটি পড়লেই বোঝা যায়। আমরা সেই সূত্র এবং আমাদের নিজস্ব গবেষণার আলোকে এই বঞ্চিত, নিগৃহীত নারী শিশুদের দুঃখে ভরা জীবনের কিছু কথা এখানে তুলে ধরতে চাই। চরে একটি মেয়ের বয়স ১০ থেকে ১২ বছর হলেই মা-বাবা বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা হয়ে যায় শিশুবধূ। আর সেই শিশুবধূ কয়েক বছর পর যখন তার বয়স কুড়ি হয় তখন হয়ে যায় বুড়ি। তবে চরের নারীদের শিশু অবস্থায় বিয়ে দেয়ার অনেক কারণই আছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দরিদ্রতা। অভাবের কারণে বয়স না হতেই বিয়ে দেয়া হয়। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নিরাপত্তাহীনতার কারণেও তাদের বাল্যবিবাহ হয়ে থাকে। মৌসুমী বিয়ের একটি ব্যাপারও কাজ করে সেখানে। বিশেষ করে ধান কাটার মৌসুমে অন্য জায়গার অল্প বয়স্ক ছেলেরা যখন চরে বেশ কিছুদিনের জন্য কাজ করতে যায় তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সেইসকল ছেলেদের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। আবার খাসজমির বন্দোবস্ত পেতে স্বামী-স্ত্রীর যুগল ছবি দরকার হয় বলেও নাকি বাল্যবিবাহ হয়। সম্প্রতি দৈনিক মানবজমিন পত্রিকার বাউফল প্রতিনিধির লেখায়ও এ ধরনের কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে মোট কথা হলো, অজ্ঞতা এটির জন্য বেশি দায়ী। শিক্ষার আলো ঠিক মতো না পৌঁছানোর কারণে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তারা জানে না এবং অতি দ্রুত তারা বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের ব্যাপারেও কিন্তু তেমন কোনো নিয়মনীতি মানা হয় না। থাকে না কোনো কাজীর ব্যবস্থা। দরকার হয় না কোনো সনদপত্রের। যৌতুক অবধারিত। এটি দেয়াই যেন সেখানে অদৃশ্য আইনে পরিণত হয়ে গেছে। আবার এই যৌতুকের কারণেই হরহামেশা ঘর ভাঙ্গে শিশুবধূর। আর এই ভাঙ্গা সংসার জোড়া লাগাতে এগিয়ে আসে না কেউ। নেই কোনো জবাবদিহিতা। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন না থাকার জন্য কোনো আইনি সমস্যাও মোকাবেলা করতে হয় না কোনো পক্ষকে। আবার যে শিশুটি আজকে বধূ হয়ে গেল অন্যের ঘরে। সেখানে সে পায় না তার সঠিক পরিচর্যা। বিয়ের ২/১ বছরের মাথায় সন্তানের জন্ম দিতে হয় তাকে। গর্ভাবস্থায় পায় না সে কোনো সেবা। অল্প বয়সে মা হওয়ার ঝুঁকি যে কত ব্যাপক হতে পারে– সেটি বোঝানোর জন্য কেউ যেন নেই। আবার সংসার ছোট রাখার জন্য যে স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ সেটিও পান না তারা মূল ভূখণ্ডের মায়েদের মতো। অদক্ষ দাইদের সেবা তারা কোনো মতে পায়। কিন্তু এতে ঝুঁকি বেশি থাকে। অতি অল্প বয়সে মা হতে গিয়ে সন্তান প্রসব করার সময় কত শিশুবধূ ও নবজাতকের যে মৃত্যু হয় তার ইয়াত্তা নেই। "বয়স সাড়ে তেরো থেকে চৌদ্দ। প্রসব বেদনায় কাতরাচ্ছে চর মিয়াজানের সুলতানা বেগম। ঘড়ির সময়ের কোনো বালাই নেই। পশ্চিম আকাশে সূর্য তখন ঢলে পড়েছে। ঘরের পেছনে মুরগিকে খাবার দিতে গিয়ে শুরু হয় প্রসব বেদনা। দৌড়ে শাশুড়ি মিনারা এসে ধরে নিয়ে যায় ঘরে। একটি পাটি বিছিয়ে তার উপর শুইয়ে দেয় সুলতানাকে। সময় হলে বাচ্চা বেরিয়ে আসবে এ কথা বলে তিনি তার কাজে চলে যান। কিছুক্ষণ পর পর এসে দেখে যান সুলতানাকে। এভাবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, কিন্তু সুলতানার সন্তান প্রসব হয় নি। ক্রমান্বয়ে রাত গভীর হতে থাকে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে সুলতানা। পুত্রবধুর এ অবস্থায় চিন্তিত নন শাশুড়ি। কারণ, তারও অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল, হয়েছিল সন্তান। এভাবে কষ্ট তাকেও সহ্য করতে হয়েছে। নিঝুম সে রাতের এক পর্যায়ে বাচ্চা প্রসব হয় সুলতানার। সন্তান প্রসব হওয়ার পর সুলতানা অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। শাশুড়ি সুলতানার মাথায় তেল মেখে দেন, সুলতানা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যায়। আর কথা বলে নি। ১০ মাস পেটে রেখে সুলতানা যে সন্তান গর্ভে ধারণ করছিল সেই সন্তানের মুখ দেখে যাওয়ার আগেই তার জীবন ওখানেই থেমে যায়" (সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ৮ জুলাই ২০০৭)। শুধু এই সুলতানাই নয়, কত সুলতানার জীবনে যে এভাবে অমানিশার আঁধার নেমে আসে তার হিসেবইবা ক'জনে রাখেন? শুধু সন্তান জন্ম দিতে গিয়েই নয় পরিমিত খাবার না পেয়ে অপুষ্টির শিকার এই শিশুবধূদের শরীরে নানা রোগবিস্তার করে। অবশেষে তেমন কোনো স্বাস্থ্যসেবা না পেয়ে অকালে ঝরে পড়ে এরা। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কন্যাসন্তান জন্মদিলেও অনেক শিশুবধূর ঘর ভাঙ্গে। কোনো অপরাধ না থাকলেও শুধু কন্যা সন্তান জন্ম দেয়াই বড় অপরাধ হয়ে যায় অনেকের। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে এখানকার প্রায় প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে। আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলেই নির্যাতনের এক অনৈতিক স্টিম রোলার হয়তো চালানো হয় এই শিশুবধূদের ওপর।

একদিকে অল্প বয়সে বিয়ে, অন্যদিকে আবার সন্তান। সন্তানের লালন-পালন করতে করতে আবার তাদের খাওয়া-পরার চিন্তা। সংসার সচল রাখতে সীমাহীন কষ্ট তাদেরই সহ্য করতে হয় নির্বিকারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃসময়ে এরা হয়ে যায় অত্যন্ত অসহায়। কোথায় যাবে কি করবে তা তারা জানে না। নদী ভাঙ্গে, আবার নতুন চর জাগে। সেখানে আবার নতুন করে বাসা বাঁধার স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত হন এই শিশুবধূরা। চলে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার নিরলস সংগ্রাম। নিজেদের কোমল হাতে স্বামীর সাথে সংসারের হাল ধরতে চেষ্টা করে। করতে থাকে নিরলস পরিশ্রম। কিন্তু সে কি পারে সেই জীবন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে? পারে কি সেই কষ্টকে জয় করতে? নিশ্চয় পারে না। কেননা সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় জাগরণ তার মধ্যে ঘটে নি। অজ্ঞতা, অবহেলা, বঞ্চনা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির আলোয় আলোকিত করে তাদের জাগরণ ঘটাতে পারলে এবং বিচ্ছিন্ন এই চরবাসীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে নিশ্চয় এ সমস্যার সমাধান হবে।

একই সঙ্গে প্রান্তের এই চরবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যক্তি খাতকেও তার সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে আসতে হবে এই অসহায় মানুষগুলোকে বাঁচাতে। বছরের এক বড় অংশ এরা মাত্র একবেলা খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। দারিদ্র্য তীব্র বলেই চরের

শিশুদের, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির কথা কেউ ভাবেন না। বাবা-মাও তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে এই 'আপদ' থেকে রেহাই পেতে চান। আমরা যদি সত্যি সত্যি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে চাই তাহলে চরের এই দুঃখী মানুষগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বাজেটকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে। নারী শিশুর দিকে আলাদা করে অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের সুযোগ প্রসারিত করতে হবে।

কন্যাশিশু ও আমাদের কর্তব্য

***আয়শা খানম**

গত দেড় দুই দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে ৩০ সেপ্টেম্বর 'কন্যাশিশু দিবস' সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কখনো কখনো সরকারি/বেসরকারি উভয় পক্ষ থেকেও দিবসটি পালন করা হয়েছে ।

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাস আসলে আমরা বেসরকারি কর্মী-সংগঠকরা কন্যাশিশুদের অধিকারের কথা বেশি ভাবতে শুরু করি। প্রবন্ধ লিখন, স্মরণিকা প্রকাশ, অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, বিবৃতি দিতে শুরু করি। এর কিছুটা মূল্য আছে এই জন্য যে, এর মাধ্যমে আমাদের নিজেদের দৃষ্টি এবং পরিবার ও সমাজে কিছুটা হলেও সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সরকারি প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরাও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। এর প্রয়োজন আছে এবং মূল্যও কম নয়।

কন্যাশিশুর জন্য বিশেষ ভাবে ভাবার প্রসঙ্গটি আসে ১৯৯০ সালে বিশ্ব শিশু সামিটে (World Summits for Children 1990)। সামিটে কন্যাশিশুর জীবন, তাদের বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব, বেড়ে ওঠা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়গুলো জরুরি হিসেবে আলোচনায় আসে। বিশ্ব সম্প্রদায় কর্তৃক কন্যাশিশুর আইনগত অধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের যথাযথ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি কন্যাশিশুর সমঅধিকার ও সমসুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৭তম বিশেষ অধিবেশন ২০০২ সালে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে উল্লেখ করা হয়, শিশুর বিশেষ করে কন্যাশিশুর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা তখনই পূরণ করা সম্ভব হবে যখন নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া অনেক দূর অগ্রসর হবে। কন্যাশিশুর অবস্থার উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ কন্যাশিশুরা একজন পূর্ণাঙ্গ নারী হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ জন্মের পর থেকে শুরু করে শিশু-কিশোরী-তরুণী (নারীর জীবন চক্র) প্রতিটি স্তরে তারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রায় একই ধরনের বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। এই বৈষম্য ঘটে দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। প্রথম থেকেই ছেলে সন্তানের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। পরিবারে পুত্র সন্তানরা পিতার সম্পত্তির বেশি অংশীদার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশীদার। যেমন, বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েদের পিতার সম্পত্তিতে কোনো অংশীদারিত্ব নেই।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য এসকল ক্ষেত্রেও বৈষম্য বিদ্যমান। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমীক্ষায় তাই দেখা যায়। তবে বর্তমানে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে। খাদ্য গ্রহণ, স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদন এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যাসন্তানের সম-অধিকার, সম-সুযোগ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে কন্যাশিশুদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অভিভাবক তথা পিতা-মাতার বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মাত্রাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তবে কন্যাশিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্কুল, কলেজে ভর্তির হার বৃদ্ধি হওয়াই এক্ষেত্রে অবস্থার উন্নয়নের একমাত্র সূচক হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। (পরবর্তীতে আর্থিক সঙ্কট, নিরাপদ পরিবেশের অভাব, যাতায়াত সমস্যা বিশেষ করে যাতায়াতকালে নিরাপত্তাহীন, উত্ত্যক্ত করা (ঈভটিজিং), বাল্যবিবাহসহ অনেক সামাজিক কারণে কন্যাশিশুদের শিক্ষা শেষ পর্যন্ত কতদূর অগ্রসর হয় তারও একটা বিশেষ সমীক্ষা ও গবেষণা হওয়া দরকার। এছাড়া CRC, শিশু অধিকার সনদ, বেইজিং কর্মসূচি ও কর্ম-পরিকল্পনায় বর্ণিত কন্যাশিশুর অধিকার (Rights of the Girl child) কতটুকু এবং কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে কন্যাশিশুর ঝড়ে পরা (Drop out) বংলাদেশে একটি বড় সমস্যা।)

কন্যাশিশু দিবস পালনের সময় একটা বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য (যা গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব) সুস্পষ্টভাবে বের করা প্রয়োজন। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনেও বিষয়টি তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, কন্যাশিশুরা জীবনের প্রথম মুহূর্ত থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে বৈষম্য, শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। কন্যাশিশুদের বিষয়ে যে সকল নির্যাতন সংগঠিত হয় তা একজন পূর্ণ বয়স্ক নারীর ক্ষেত্রেও সত্য।

---

* সাধারণ সম্পাদিকা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

আজ ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা যারা দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশের কন্যাশিশুর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগঠক হিসেবে কাজ করছি, তাদের একটু পেছন ফিরে কয়েকটি বিষয়কে মূল্যায়ন করা দরকার। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই কাজটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. ২০০০ সালে গৃহীত শিশু সনদ;
২. ২০০২ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (General Assembly) বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব সমূহ;
৩. ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশনের বর্ণিত কন্যাশিশুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সমূহের কথা, যেখানে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য সমস্যার কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে;
৪. জাতিসংঘের মহাসচিবের বিশেষ প্রতিবেদন (২০০৫), Beijing Platform for Action-এর দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনে কন্যাশিশুর মানবাধিকার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবনের নিরাপত্তার অধিকারসহ যেসকল ইস্যু চিহ্নিত হয়েছে সেগুলোর পরিবর্তনে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও সদস্য রাষ্ট্র সমূহকে নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ২০০০ সালে বেইজিং +৫ এর Political Declaration and Outcome Document-এ যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ করণীয়ের কথা বলা হয়েছে তা কতটুকু কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা আজ নিরীক্ষাধর্মী মন নিয়ে অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র, সরকার, নাগরিক সমাজ, নীতি-নির্ধারক ও বেসরকারি সংগঠকদের দেখা দরকার। (কারণ, একটি ইস্যু এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম সেশনে বিশেষভাবে Outcome Document-এ উল্লেখ করা হয় যে, শিশুশ্রম, নির্যাতন, বিশেষ সুযোগের অভাব, যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন হয়রানি কন্যাশিশুকে ক্রমাগত মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আজ ২০০৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান বিবেচনা করা দরকার।)

২০০৫ সালে World Summit বা জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পুনরায় অঙ্গীকার করেছিলন যে, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য ও সংগঠিত সকল প্রকার নির্যাতন, যৌন হয়রানী বিলোপের জন্য পূর্ব ঘোষিত সকল প্রকার দেশীয় ও আন্তার্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতিসংঘের ৬০তম অধিবেশনে কন্যাশিশুর জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব (Resolution 60/141 on the girl child) গ্রহণ করা হয়। (In which it expressed its deep concern interaction, discrimination about girl child and the violation after rights and stressed the important of substantive assessment of the implementation of the progressive platform or action with life - Cycle perspective.)

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত (১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর) নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের দলিল 'সিডও সনদ' ও 'শিশু অধিকার সনদ ১৯৯০' দু'টি কনভেনশনেই কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়। সিডও সনদের General Recommendation no. 24-এ কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যের বিশেষ ঝুঁকির বিভিন্ন দিক বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। সিডও সনদ বিশেষ করে General Recommendation-24 ও শিশু অধিকার সনদ বিশেষভাবে কন্যাশিশুর স্বাস্থ্য অধিকার ও সুযোগের অভাব একটা বিশেষ দুষ্টচক্রের সৃষ্টি করে কন্যাশিশুর জীবনে যা পরিণতিতে নারীর জীবনের অনেক ধরনের নির্যাতনে প্রাথমিক ও শক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে, যা থেকে নারীদের মুক্ত হয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

যথাযথ শিক্ষার অভাব, উপযুক্ত তথ্য প্রাপ্তির অভাব, বয়ঃসন্ধিক্ষণের উদ্ভূত সমস্যা, যৌন শিক্ষা, যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের অভাব, বাল্যবিবাহ, যৌন জীবনে স্বাস্থ্য সমস্যা, গুরুতর নারী নির্যাতনের কারণ, HIV/AIDS ও বিপন্ন মানবাধিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন ভয়াবহ দুষ্ট চক্রে সমাজ ও রাষ্ট্র যখন পড়ছে তখন সেই রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া, মানবাধিকার, সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া কতটা জটিল হয়ে পড়ছে তা সহজেই অনুমেয়।

জাতিসংঘের স্বাধীন গবেষক দল কন্যাশিশুর বিরুদ্ধে নির্যাতন বিষয়ে একটি গবেষণা করে যে প্রতিবেদন পেশ করেন তাতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কন্যাশিশু নির্যাতন ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কন্যাশিশুর সমস্যার কথাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন: বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, জোর পূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন, যৌনাঙ্গ কর্তন, কন্যাশিশুর ভ্রূণ হত্যা, জোর পূর্বক দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা, কন্যা শিশু পাচার প্রভৃতি

২০০৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর The Division for the advancement of women, UNICEF-এর সহযোগিতায় একটি গবেষণা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে Expert Group. সভায় Report on Elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child.
কন্যাশিশুর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতনের বিলোপ শীর্ষক গবেষণা ও প্রতিবেদনেও একই সংস্কার সমূহের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অনেকগুলো করণীয় সুপারিশ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

জতিসংঘের মহাসচিবের In depth Study on all forms of violence against women-এ এটি অরো সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কন্যাশিশু ও তরুণীরা জীবনচক্রের প্রথম থেকে যে সকল যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানীর শিকার হচ্ছে সেসকল Traditional practice বা প্রতিক্রিয়াশীল চরম পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গীগত অভ্যাস, প্রথা, আচরণ প্রক্রিয়ায় বিদ্যামান রয়েছে তা নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে করে তুলেছে গভীর সঙ্কটপূর্ণ ও জটিল। যেমন: Female infanticide, Prenatal sex selection, Female genital mutilation/Cutting, son preference, Early marriage and forced marriage, Crimes in the name of honor, Dowry-related violence etc.

এসব ঘটনার কতকগুলো পরিবারে বা পরিবারের মাঝে পিতা-মাতা পারিবারিক সমস্যা দ্বারা আর কিছু ঘটনা সামাজিকভাবে অন্যত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কাজের ক্ষেত্রে সংগঠিত হয়। আর এসকল ঘটনার মূলে আছে

(১) পশ্চাৎপদ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

(২) পশ্চাৎপদ সামাজিক সংস্কৃতি

(৩) অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা

(৪) ধর্মীয় চরম গোঁড়ামী

(৫) শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনগ্রসরতা

(৬) ব্যাপক জনসাধারণের শিক্ষা ও কন্যাশিশু ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় দেশ হিসেবে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভূমিকা ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন ও গ্রহণ করে। সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থিত ১৭৮ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি সনদের মূল দলিলটি সদস্য রাষ্ট্র সমূহের স্বাক্ষর, অনুসমর্থন ও জাতিসংঘ নীতিমালার অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রথম দিনেই যেসকল রাষ্ট্র এতে স্বাক্ষর দান করে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। মূলত শিশু অধিকার সনদের খসড়া প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়নের সকল পর্যায়েই বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশ এই সনদে অনুসমর্থন দান করে, অর্থাৎ সনদের বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় সুস্পষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সনদ কনভেনশন ঘোষণা সমূহে রয়েছে অঙ্গীকার। সিডও Beijing কর্মসূচি সর্বশেষ বা মিলেনিয়াম ডেভলোপমেন্ট গোল (MDG)-এর প্রতি রয়েছে অঙ্গীকার, রয়েছে বেসরকারি প্রচেষ্টা। এসকল কিছু বিদ্যমান সত্ত্বেও অনায়াসে বলা যায়, কতক ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে বটে, তবে মূল ও ব্যাপক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। যেমন:

- বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে;
- যৌন হয়রানি;
- যৌন নির্যাতন যা আছে পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, রাস্তাঘাটে, সমাজের বিভিন্ন স্থানে;
- কন্যাশিশুর দেহ ব্যবসায় নিয়োগ ও পাচার করা;
- ধর্ষণ (মহিলা পরিষদের কাজের অভিজ্ঞতা ও রক্ষিত রেকর্ড হতে);
- পরিরারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা যৌন নির্যাতন;
- স্বাস্থ্য সুযোগ ও প্রজনন বিষয়গত নিষ্ঠার অভাব, প্রজনন অধিকার ও এ বিষয়ে স্বাস্থ্য সম্মত পদক্ষেপ যথাসময়ে গ্রহণের বিষয়ে অজ্ঞতা;
- নিরাপত্তাহীনতা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে নয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও পরিস্থিতিগত জটিলতা সমাজের সামগ্রিক সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয় যার প্রমাণ ইভ টিজিং -এ
- কিশোরী মায়েদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে সকল প্রকার নিরাপত্তাহীন জীবন
- ধর্ষণের শিকার কিশোরীদের সন্তান নিয়ে সামাজিক হেয় দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কৃতির চরম শিকার হয়ে মানসিকভাবে গ্লানিকর জীবন যাপন
- দরিদ্র কিশোরীরা কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছে শিল্প কলকারখানাসহ সর্বত্র যেখানে যৌন নির্যাতন ও যৌন হয়রানি
- গৃহ কর্মে কন্যাশিশু ও কিশোরীদের বহুমুখি অমানবিক আচরণ, শোষণ ও নির্যাতন

উল্লেখ্য, কন্যাশিশুরা পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবক, সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য, কিশোর, যুবক, পুরুষ এমনকি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দ্বারাও নির্যাতনের শিকার হন। এতে তাদের জীবনের নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ঈভ টিজিংসহ পুলিশ দ্বারা ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপসহ ভয়াবহ ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে ৩/৪ বৎসরের কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ অবসানের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দরিদ্রতা হ্রাস ও বিলোপ– এসকল কর্মসূচির সঙ্গে পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেজন্য বারবার আমরা নারী আন্দোলনের পক্ষে সুপারিশ করছি পাঠ্যসূচিতে 'জেন্ডার ইস্যু' সংযুক্ত করার জন্য। যেনো সমাজে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং নারী ও কন্যাশিশুকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে উত্থাপন করার মানসিকতার সমাপ্তি ঘটে।

গবেষণা প্রতিবেদন সমূহের ভাষায় :

"Development policies and resources on child and youth health are often gender-blind and, as a result, the special needs and priorities of girls are neglected. Many interventions target young children (for early intervention) or older adolescents (for catch-up interventions) and, as a result, many at-risk girls between the ages of 6 and 14 are missed. Policies and programs to address the situation of girls are often reactive ("rescue and recovery") instead of proactive and focused on prevention and protection. Yet in the face of a number of abuses discussed in this report, there is no full recovery for many of these girls. More efforts must be proactively directed towards the protection and promotion of the human rights of girls.

Girls often lack access to girl-friendly, safe and supportive spaces, including at school. Yet studies find that girl-friendly spaces, which are discussed throughout this report, are often among the best platforms from which governments, international organizations and nongovernmental organizations can protect and promote the human rights of girls. It is important that girls have a voice and are enabled to take part in the deliberations that address their life chances and potential as human beings. Ignoring the voice of the girl child effectively prevents her from influencing decisions regarding her life and development. Girl's right to express themselves must be promoted and protected.

A life cycle approach looks at the entire life of a girl, including early childhood, preschool and school-going years, through adolescence to pregnancy and womanhood. A life cycle approach reveals that discrimination and violence against girl children occurs before birth, during infancy, and continues beyond childhood and adolescence into adulthood. Girls face discrimination and violence in all settings, often in places where they should be protected, in their home, school, and immediate community".....

ভ্রূণ অবস্থা থেকে পূর্ণ নারী হওয়া পর্যন্ত সময়ে কন্যাশিশু যেনো পূর্ণ সুযোগ নিয়ে বিকশিত হয়ে নাগরিক হিসেবে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য পরিকল্পনা নিতে হবে রাষ্ট্র, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। কন্যাশিশুর পূর্ণ নাগরিক অধিকার বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা, রাষ্ট্রের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বাংলাদেশের পরিবার সমূহের এক্ষেত্রে অনেক করণীয় রয়েছে বলে আমি মনে করি। যে সুযোগ ও অধিকার সমূহ ইতোমধ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষিত হলেও অনেকক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে না পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য।

কন্যাশিশু ও নারীর মানবাধিকারের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হলে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে। সংক্ষেপে তাই আমার সুপারিশসমূহ হলো -

১. কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি ইতিবাচক সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়তার সাথে পারিবারিকভাবে গড়ে তোলা, যার প্রভাব ও প্রতিফলন পড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রে;

২. পাঠ্যসূচিতে জেন্ডার ইস্যু (Gender Issue) স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা;

৩. শিশু সনদ (CRC), সিডও সনদ, BPFA, বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা National Action plan সরকারিভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া ।

৪. MDG-এ বর্ণিত নারী শিক্ষার কর্মসূচি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা;

৫. পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার নিশ্চিত করা। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে এই প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা সম্মত হয়ে এসেছিলেন।

৬. শিল্প, কল-কারখানা বিশেষ করে পোষাক শিল্পে যেসকল নারী কাজ করে তাদের বয়স অধিকাংশই ১৮-এর মাঝে। এসকল ক্ষেত্রে কর্মরত কন্যাশিশুদের অর্থনৈতিক শোষণ, স্বাস্থ্য অধিকারহীনতা ও যৌন নির্যাতনের অবসানের জন্য শিল্প মালিক, সরকার, শ্রমিক সংগঠনের যৌথভাবে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার। বাংলাদেশের জন্য তা একান্ত জরুরি ও আশু কর্তব্য।

৭. কন্যাশিশুকে ঈভটিজিংসহ বিভিন্ন প্রকার যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তরুণ, কিশোর, যুবসমাজকে কন্যাশিশু অধিকার ফোরামে ও বৃহত্তর পরিসরে নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মসূচিতে যুক্ত করা দরকার।

৮. কন্যাশিশুর অধিকর প্রতিষ্ঠার জন্য অভিভাবক ফোরাম গঠন করা প্রয়োজন।

৯. পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে কিশোরী-তরুণী তথা কন্যাশিশুদের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা দরকার। তাদের মতামত ও অংশগ্রহণকে প্রবীণদের সম্মান দিতে হবে। জীবন পরিচালনায় জীবন গড়ে তোলায় তাদের ভূমিকা ও মতামত গুরুত্বপূর্ণ এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে।

১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠ্যসূচি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে তরুণ তরুণীদের যুক্ত করতে হবে;

১১. জাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. কন্যাশিশুরা জাতীয় সম্পদ এই আদর্শ ও ভাবনার সংস্কৃতি জাতীয়ভাবে গড়ে তুলতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

২. Beijing Declaration and Platform for Action with Beijing+5 Political Declarations and Outcome Document- Published by the United Nations Department of Public Information - DPI/1766/Rev.1-00-72393-August, 2001-20M.

৩. Elimination of all forms of Discrimination and violence against the girl child Report of the Expert Group Meeting, organized by The Division for the advancement of Women in collaboration with UNICEF, Innocent Research Centre, Florence, Italy, 25-28 September 2006.

নারীবাদীদের মুখোমুখি কার্ল মার্কস

এম এম আকাশ*

ভূমিকা

বেচারা বুড়ো মার্কসকে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক এখনো চলছে। এবার তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বর্তমান যুগের 'বিপ্লবী' (Radical) নারীবাদীরা। বেচারা মার্কস অবশ্য জীবিত নেই। কবর থেকে উঠে এসে নতুন পারিপার্শ্বিকতায় নতুন অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তাঁর পুরাতন সিদ্ধান্তগুলো সংস্কার (Modification), পরিত্যাগ (Rejection) বা বিকশিত (Develop) কোনোটি করারই সুযোগ তাঁর নেই। সুযোগ থাকলে তিনি যে কি করতেন তা বলা মুশকিল। জীবিত থাকা কালে তিনি তাঁর অনেক সিদ্ধান্তই পুনর্বিবেচনা করেছিলেন। মার্কসের ডায়ালেটিক পদ্ধতি অনুযায়ী তার সকল সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক এবং স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল। মার্কসের বন্ধু এঙ্গেলস তাই বলে গিয়েছিলেন, Nothing is eternal but eternally changing, আর মার্কস তাঁর অতিভক্তদের বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'আমি স্বয়ং মার্কসবাদী নই'।

মার্কসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা মার্কসের বিরুদ্ধে সচরাচর যে অভিযোগগুলো উত্থাপন করে থাকেন তার চমৎকার একটি বয়ানের সাক্ষাৎ মিলবে হেইডি হার্টম্যানের বহুল আলোচিত 'The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards A More Progressive Union' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির শিরোণাম বেশ দ্বান্দ্বিক। মনে হয় লেখক মার্কসবাদ থেকে নারীবাদকে প্রথমে বিযুক্ত করতে চাচ্ছেন কারণ তাদের বিবাহটি তার মূল্যায়নে সুখকর হয় নি। তবে মার্কসবাদের সঙ্গে নারীবাদের 'সুখকর মিলনের' সম্ভাবনার একটি ইঙ্গিত অবশ্য প্রবন্ধটির উপশিরোণামে রয়েছে। আরো মনে হচ্ছে, সেদিনে অগ্রসর হওয়াই লেখিকার মনোগত অভিপ্রায়।

প্রবন্ধটির প্রথম বাক্যেই লেখিকা তার এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরে বলেছেন, 'The marriage of Marxism and feminism has been like the marriage of husband and wife depicted in English common law; Marxism and feminism are one, and that one is Marxism. Recent attempts to integrate Marxism

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

and feminism are unsatisfactory to us as feminists because they subsume the feminist struggle into the larges struggle against capital. To continue our simile further, either we need a healthier marriage or we need a divorce'.

মার্কসবাদ ও নারীবাদের বিয়ের ব্যাপারটি স্বামী ও স্ত্রীর বিয়ের মতোই, যেমনটি ইংলিশ কমন ল-র (যেখানে পরিবার এক ও অভিন্ন, আর পরিবারে স্বামীই হলো সব) মধ্যে বলা হয়েছে; এখানেও মার্কসবাদ ও নারীবাদ একটি একক এবং এই একক হলো মার্কসবাদ। তাই মার্কসবাদ ও নারীবাদকে সমন্বিত করার সাম্প্রতিক উদ্যোগ নারীবাদী হিসেবে আমাদের কাছে সুখকর নয়। কেননা এক্ষেত্রে নারীবাদী সংগ্রামকে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামের অধীনস্থ করা হয়। সেজন্য (মার্কসবাদ ও নারীবাদ) এ উপমাটি আবারো অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের একটি স্বাস্থ্যকর বিয়ের দরকার নতুবা আমরা এর বিচ্ছেদ চাই।

পরবর্তী সময়ে এই প্রবন্ধটিতে উপরিউক্ত বয়ানকে ভেঙ্গে বিশ্লেষণ করে মার্কসের বিরুদ্ধে যেসকল সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক. কার্ল মার্কস 'মানবমুক্তির' স্বপ্ন দেখেছেন সেজন্য তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ মানব মুক্তির সংগ্রামে সুনির্দিষ্টভাবে বা স্বাধীনভাবে নারীমুক্তির প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করা হয় নি অর্থাৎ শ্রেণি বিভক্ত সমাজে বিদ্যমান শ্রেণি শোষণের অবসান হলেই মানুষের সামগ্রিক মুক্তি আসবে এবং মানুষের সামগ্রিক মুক্তি এলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মুক্তি অর্জিত হবে-এটিই মার্কসের ভাষ্য। এভাবেই র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মার্কসকে পাঠ করেছেন এবং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। এভাবে নারীমুক্তিকে 'মানবমুক্তি'র অধীনস্ত বিষয়ে পরিণত করতে 'বিপ্লবী নারীবাদীরা' রাজী নন। তাদের মতে, 'মার্কসীয় মানবমুক্তির' ধারণাকে নারীমুক্তির ধারণা অতিক্রম করে যায়।

খ. মার্কসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্ছে মার্কস গৃহ-শ্রমকে আলাদাভাবে মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করেন নি। তাই গৃহের অভ্যন্তরে পিতৃতন্ত্র ভিত্তিক নারী-পুরুষ অসম সম্পর্কগুলো তিনি আদৌ নজর দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখেন নি। এমন কি উৎপাদন-অনুৎপাদনশীল শ্রম নিয়ে মার্কসের যে আলোচনাগুলো আমাদের হাতে রয়েছে তাতে দেখা যায় যে মজুরি শ্রম ছাড়া বাকী সকল শ্রমকেই তিনি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় অনুৎপাদনশীল শ্রম হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই শেষ বিচারে গৃহশ্রমও মার্কসের কাছে এক ধরনের অনুৎপাদনশীল শ্রম। তবে মার্কসের লেখায় একথাও আছে যে পুঁজিবাদ সমস্ত সেবা ও বস্তুকেই ধীরে ধীরে পণ্যে রূপান্তরিত করে থাকে ফলে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গৃহশ্রম পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে উৎপাদনশীল শ্রমের মর্যাদা লাভ করতে পারে। এরূপ ইঙ্গিত মার্কসের লেখায় আছে।

গ. বিপ্লবী নারীবাদীদের কেউ কেউ ব্যক্তি মার্কসের বিরুদ্ধে 'পুরুষতন্ত্রের' অভিযোগও এনেছেন। এজন্য কোনো কোনো বুর্জোয়া পণ্ডিত মার্কসের সাংসারিক ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বেশ ঘাটাঘাটি করেছেন।

বিশেষত ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি উচ্চারণে একবার বেফাঁসভাবে মার্কস বলেছিলেন যে 'রমণীর' মধ্যে তাঁর ঈপ্সিত পছন্দের গুণটি হচ্ছে-'দুর্বলতা'। কোনো কোনো নারীবাদী একে মার্কসের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের মোক্ষম স্বীকারোক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন।

মার্কসের পক্ষে

এসকল অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের ব্যক্তিগত অবস্থানটি হচ্ছে,'আমি মার্কসের পক্ষে কিন্তু বিপ্লবী নারীবাদীদেরও বিপক্ষে নই।' অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে, বিপ্লবী নারীবাদীদের প্রশ্নগুলো সঠিক; কিন্তু সেগুলোকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্থাপন করা সঠিক নয়। এ অবস্থানটি একটু কুটাভাসপূর্ণ (paradoxical) অবস্থান কিন্তু এর একটি যুক্তিসিদ্ধ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমি এ প্রবন্ধে দেয়ার চেষ্টা করব।

আমার মূল বক্তব্যটি হলো এই যে, বিপ্লবী নারীবাদীরা মার্কসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা মেনে নিলেও মার্কসের মৌলিক মতবাদের বিরুদ্ধে নারীবাদকে দাঁড় করানোর কোনো যুক্তি নেই। বরং মার্কসের সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন এবং নারীর সার্বিক মুক্তির স্বপ্ন উভয়ই পরস্পর পরিপূরক।

এবার আসল কথায় আসা যাক। বিপ্লবী নারীবাদীদের অভিযোগ যে, মার্কস শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে ভেঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের সংগ্রামকেই নারীমুক্তির জন্য 'যথেষ্ট' মনে করেছেন; কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও নারীর শোষণ বিলুপ্ত হয় নি। এ কথা সত্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজে নারীকে ঘরের বাইরে অর্থনৈতিক উপার্জনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। উপার্জনের সময় মাতৃত্বের জন্য যথোপযুক্ত ছুটি বা অবকাশও নারীরা পেয়েছে। নারীর জন্য আর্থ-সামাজিক সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। নারীরা বৈষম্যহীন নাগরিক অধিকার লাভ করেছে এবং অধিক মর্যাদাও তাদের ছিল। এসবের ফলে নিশ্চিতভাবে নারীমুক্তিকে সমাজতন্ত্রের অধীনে অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব হয়েছে; কিন্তু তারপরও শেষ পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজেও নারীদের পূর্ণ মুক্তি অর্জিত হয় নি। সেখানেও গৃহে তাদের পারিবারিক গৃহকর্ম থেকে মুক্তি বা পুরুষের ভিন্নধর্মী বহুমুখী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি শেষ পর্যন্ত ঘটে নি। পিতৃতান্ত্রিক শ্রমবিভাজন থেকে নারী যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজেও মুক্ত হতে পারে নি সেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজেও তার মুক্তি অর্জিত হয় নি। উপরন্তু, ঘর থেকে বাইরে আসার যে সুযোগ সমাজতান্ত্রিক সমাজে তৈরি হয়েছে সেটি গ্রহণ করার পর একার্থে নারীর পরিশ্রম দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একটি কর্মস্থলে মজুরি বা বেতনের বিনিময়ে শ্রম, অপরটি বিনা

মজুরিতে গতানুগতিক সাংসারিক শ্রম। বিপ্লবী নারীবাদীরা তাই 'সমাজতন্ত্রের মুক্তিকে' নারীমুক্তির সমার্থক তো বিবেচনা করেনই না; বরং এটিকেই তারা 'দ্বৈত শোষণ' বা 'Double exploitation' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

উপরিউক্ত অভিযোগের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা রয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লোবোত্তর সমাজগুলোতে দীর্ঘদিন পরেও পিতৃতান্ত্রিক শ্রমবিভাজনকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হয় নি; বরং পিতৃতান্ত্রিক শ্রমবিভাজনের মূল্যবোধ এবং সে অনুযায়ী নারীর ট্রাডিশনাল বেতনহীন গৃহকর্মী ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রেখেই নারীকে ঘরের বাইরে কাজের একটু সুযোগ করে দেয়া হয়েছে মাত্র। তবে সেই বাইরের কাজের পরিবেশ ও শর্তকে পুঁজিবাদের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বৈষম্যহীন করতে সক্ষম হয়েছে- এমনটি দাবি করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। তাহলে মার্কসের বিরুদ্ধে অভিযোগকে দাঁড় করাতে হলে বলতে হবে যে মানবসমাজের মুক্তি বলতে মার্কস যদি সমাজতন্ত্রকেই বুঝিয়ে থাকেন তাহলে মার্কস অপূর্ণ বা আংশিক মানবমুক্তিকেই বুঝিয়েছেন। পুরুষ ও নারীর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির কথা তিনি বলেছেন ঠিকই; কিন্তু তাতে গৃহের অভ্যন্তরে পুরুষের অন্যায় কর্তৃত্ব থেকে নারীর মুক্তি যে অর্জিত হয় না তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের অভিযোগের গোড়াতেই একটি ভুল পূর্বানুমান রয়েছে। মূল বা গোড়ার প্রশ্নটি হচ্ছে মার্কস কি 'সমাজতান্ত্রিক সমাজকেই' পূর্ণ মানবমুক্তির আদর্শ সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন?

আসলে মোটেও ব্যাপারটি সেরকম নয়। মার্কসের মতে, মুক্ত সমাজকে হতে হবে শ্রেণিহীন সমাজ। আর মার্কসের 'জার্মান ভাবাদর্শ' গ্রন্থের ভাষ্য অনুযায়ী শ্রেণিহীন সমাজে শ্রমবিভাজন হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন একটি বিষয় এবং সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছা মতো সকালে রাঁধবে, দুপুরে কারখানায় কাজ করবে, বিকালে টেনিস খেলবে, রাতে চাঁদে গিয়ে বিশ্রাম নিবে। কাজকে বা শ্রমকে তখন ঐ অফুরন্ত প্রাচুর্যের সমাজে কেউই ভয় করবে না; শ্রম হয়ে যাবে নিজ নিজ ক্ষমতা, দক্ষতা ও প্রতিভা প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল মাধ্যম মাত্র। সেই ধরনের একটি সমাজ হবে সম্পূর্ণ স্বশাসিত এবং সেজন্য 'পিতৃতন্ত্র', 'গণতন্ত্র', 'রাষ্ট্রতন্ত্র' কোনোকিছুই আর সেখানে অস্তিত্বশীল থাকবে না। মার্কসের এ মহৎ পরিপূর্ণ 'মানবমুক্তির স্বপ্ন' নারীবাদের বিরুদ্ধে তো নয়ই বরং নারীবাদের কথিত নারীমুক্তিকে তা অতিক্রম করে উচ্চতর পর্যায়ের এক অপরূপ সমাজ বীক্ষণ (social vision) আমাদেরকে উপহার দেয়। এ ধরনের সমাজকে মার্কস বলেছেন 'সাম্যবাদী' সমাজ এবং সেজন্যই '*গোথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে*' গ্রন্থে মার্কস 'সমাজতন্ত্রকে' দেখেছেন মানবমুক্তির সমাজ তথা সাম্যবাদী সমাজে পৌঁছানোর পথে একটি ত্রুটিপূর্ণ উত্তরণশীল সমাজ হিসেবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজকে অতি আদর্শায়িত করার দায়িত্ব তাই মার্কসের নয়। এ দায়ভার আসলে বর্তাবে তাঁর অযোগ্য উত্তরসূরীদের ঘাড়ে। মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, মার্কস যেহেতু শ্রেণিভিত্তিক সমাজের অবসানের পক্ষে তাই শ্রেণির অনিবার্য অনুষঙ্গ বাধ্যতামূলক শ্রমবিভাজনকেও মার্কস তাঁর আদর্শায়িত সমাজ তথা সাম্যবাদে অনুমোদন করেন নি। সে হিসেবে আদিম সাম্যবাদী সমাজে বয়স ও লিঙ্গ ভেদে যে শ্রমবিভাজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিলো, তা বাদ দিলে বাকি সকল শ্রেণি বিভক্ত সমাজের শ্রমবিভাজনের মধ্যেই রয়েছে কোনো না কোনো ধরনের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অসমতা। যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজও শ্রেণী বিভক্ত সেহেতু সেখানেও শ্রেণিবিরোধ ও অসমতা রয়েছে। তবে এই অসমতাগুলো ব্যক্তি-মালিকানার অনুপস্থিতির কারণে বৈরিতামূলক না হওয়ারই কথা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে লেনিন ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এসকল বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বও কখনো কখনো ঠিক মতো পরিচর্যা করা না হলে তা বৈরিতামূলক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজের এই অবৈরিতামূলক অসমতাগুলো দূর করে 'ঐচ্ছিক ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমবিভাজন' চালু না করা পর্যন্ত পূর্ণ মানবমুক্তি তথা সাম্যবাদ যে অসম্ভব সেটা মার্কস যে শুধু বুঝেছিলেন তা নয়, বলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে শ্রমবিভাজন শূন্য সাম্যবাদী সমাজ তখনই সম্ভব যখন অপ্রিয় দৈহিক শ্রমগুলো বা সকলের অপছন্দনীয় কিন্তু সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় একঘেঁয়ে কাজগুলোর (যেমন ধরুন ছোটখাট নানা ধরনের গৃহকর্ম বা নিছক ঘাস কাটা!) যন্ত্রায়ন সুসম্পন্ন হবে এবং রোবটরাই যখন সেসকল দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে নিবে। একমাত্র তখনই সেই প্রাচুর্য ও অবসর সমৃদ্ধ সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ঝোঁক ও সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বা সৃজনশীল শ্রমে আনন্দের সঙ্গে ব্যাপৃত রাখার সুযোগ পাবেন। এমনকি 'সন্তান ধারণ' নিয়ে বর্তমানে যে অনিবার্য লিঙ্গভিত্তিক বায়োলজিকাল শ্রমবিভাজন রয়েছে সেটিও তখন ইচ্ছাধীন একটি বিষয়ে পরিণত হতে পারে। নতুন প্রযুক্তির অধীনে নারী-পুরুষ কেউই তখন সন্তান গর্ভে ধারণ নাও করতে চাইতে পারেন এবং 'স্পার্ম ব্যাংক' বা টেস্ট টিউব বেবীর ব্যবস্থা নিয়েই কেউ কেউ তখন সুখী থাকতে পারেন।

কিন্তু সে ধরনের প্রাচুর্যময় সাম্যবাদী সমাজ পৃথিবীতে কোথাও এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। বরং যে সমাজতন্ত্রের ধীরে ধীরে সাম্যবাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা ছিলো তা মোটেও সেদিকে অগ্রসর হয় নি। এ সমাজতন্ত্র বাস্তবে যেটুকু অর্জিত হয়েছে তা হচ্ছে 'সার্মথ্য' ও 'যোগ্যতা' অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা; কিন্তু যোগ্যতার জন্য তারতম্যের ব্যাপারটি নানাধরনের ঐতিহাসিক ও প্রযুক্তিগত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই নারীদের পশ্চাৎপদ শ্রম ক্ষেত্রগুলোতে আটক রেখেছে। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদ উভয় সমাজেই তা সত্য ।

তাই বাস্তব সমাজতান্ত্রিক সমাজকেও পূর্ণ নারীমুক্তির সমাজ বলা যাবে না। আমার ধারণা মার্কস নিজেও তা বলতেন না। কারণ মার্কস নিজেই সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদের নিম্নতর স্তর হিসেবে অভিহিত করে গেছেন। মার্কসের ভাষায়, পুঁজিবাদের জন্মচিহ্ন (birth marks) তার গায়ে লেগে আছে।

গৃহে শ্রমের বিভাজন বনাম সামাজিক শ্রেণি বিভাজন

আমরা যখন কোনো একটি সমাজে শ্রেণি বিভাগের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি তখন শ্রেণি বিভাগের যে আবশ্যকীয় উপাদানগুলো বিবেচনায় নেই সেগুলো যথাক্রমে নিম্নরূপ:

ক. সবচেয়ে প্রথমে আসে উৎপাদনের বৈষয়িক উপায়গুলোর মালিকানা সম্পর্ক।

খ. তারপর আসে সেই উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীদের শ্রমবিভাজন নির্ধারণে সেই মালিকানা সম্পর্কের প্রতিফলন।

গ. সব শেষে আসে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারীদের আয়-ভোগ ও সামাজিক মর্যাদার তারতম্য নির্ধারণে সেই শ্রমবিভাজনের প্রতিফলন।

মার্কসের মতে, শ্রেণি বিভক্ত সমাজে যারা নিছক শ্রমশক্তির মালিক হয় (নারী-পুরুষ নির্বিশেষে) তারা উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিকদের ওপর শ্রম প্রয়োগের জন্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ফলে তাদের স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের সুযোগ ও স্বাধীনতা কমে যায়। মালিক শ্রেণি তাদের উপর নিজেদের পছন্দ মতো যন্ত্রপাতি ও শ্রমবিভাজন চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন। মার্কস আরো দাবি করেন যে এ ধরনের ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক শ্রমবিভাজনে শ্রমের মূল্য সংযোজন বা ফলাফলের বণ্টনটাও ব্যক্তি মালিকরা এমনভাবে নির্ধারণ করে দেন যাতে নিছক শ্রমশক্তির অধিকারীরা কখনো উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করে নিজেরাই উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয়ে যেতে না পারেন। এটিই মার্কসের উদঘাটিত শ্রেণি বিভক্ত সমাজের শোষণমূলক সম্পর্কের মর্মবস্তু। যদি শ্রমজীবীরা কোনোভাবে উদ্বৃত্তের অধিকারী হয়ে যায় তাহলে তারা আর মালিকদের ওপর নির্ভরশীল থাকবেন না এবং ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক শোষণ ব্যবস্থাটিও তখন আর টিকে থাকবে না।

এ উদ্বৃত্ত শোষণের হাতিয়ার ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদের উপরেই মার্কসের জোরটা পরেছে সবচেয়ে বেশি। এটিই ছিলো তার মতে মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি। মার্কসের উল্লিখিত যুক্তিসূত্র অনুসরণ করে বিপ্লবী নারীবাদীরা হয়তো বলতে চাইবেন যে গৃহের সম্পত্তির মালিক যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রীরা যেহেতু সেখানে মজুরিহীন শ্রম দিয়ে আসছেন যেহেতু 'স্ত্রী'-র এ ধরনের সেবা/শ্রমের শোষকও হচ্ছেন স্বয়ং স্বামী বা পরিবারের অন্য সদস্যবৃন্দ। এখানে গৃহকর্মে নারীশ্রম বিনা মজুরিতে যে উদ্বৃত্ত তৈরি করছে সেটিই বাকি পারিবারিক সদস্যরা নির্বিঘ্নে শোষণ করে নিচ্ছেন। সুতরাং গৃহই পরিণত হচ্ছে এক ধরনের অসম সম্পর্ক ভিত্তিক শোষণের ক্ষেত্র। এ ধরনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ চিত্রের ক্ষেত্রে মার্কসের পক্ষে বা বিপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো মতামত বা বক্তব্য এখন পর্যন্ত আমি খুঁজে পাই নি। তবে এ ব্যাপারে অপ্রত্যক্ষভাবে মার্কসের একটি বক্তব্য নির্মাণের চেষ্টা নিচে করা হলো।

যারা মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন যে, মার্কস '*পুঁজি*' গ্রন্থে শ্রমশক্তির মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, পুঁজিপতিরা শ্রমিককে যখন মজুরি প্রদান করেন তখন তাকে 'শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের' জন্য যতটুকু মূল্য দেয়া দরকার ততোটুকুই দিয়ে থাকেন। যেহেতু 'শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের' জন্য দরকার হয় পরিবারের প্রতিপালন সেহেতু পুঁজিপতির প্রদত্ত মজুরির মধ্যে শুধু ব্যক্তি শ্রমিকের ভরণপোষণ খরচ নয়, তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য একটি মূল্য হিসাব করে দেয়া হয়। এ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিপতি মালিক সমগ্র 'শ্রমিক পরিবারটিকে' এমন মজুরিই প্রদান করে থাকেন যাতে শ্রমিক পরিবারের কর্তাটি মৃত্যুর আগে আরেকজন শ্রমিক তৈরি করে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করতে সক্ষম হন এবং পরবর্তী প্রজন্মেও মালিক পক্ষ শ্রম-ঘাটতির সম্মুখীন না হন। মার্কসের মতে, মালিকের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের কারণেই মালিককে এরূপ বিবেচনা করতে হয়। এটি কোনো উদারতার ব্যাপার নয়। এরূপ বংশানুক্রমিক নির্মম মজুরি শোষণের এ ব্যবসায় ব্যক্তিপুরুষ শ্রমিকের লব্ধ আয়ের একটি অংশ সর্বদাই চলে যাচ্ছে বউ-ছেলে-মেয়ের পেছনে এবং তার বিনিময়ে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনমূলক সাংসারিক কাজগুলো শ্রমিক পরিবারটির বউ-ছেলে-মেয়েরাই করে থাকে, সেটিই পুঁজিবাদের স্ট্যান্ডার্ড অকথিত ব্যবস্থা। বস্তুত এভাবেই বুর্জোয়া সমাজের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারগুলোর জীবন নির্বাহ হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় সচরাচর পুরুষটিই হন সমগ্র সংসারের রুটি-রুজির আহরণকারী (Bread Winner) আর স্ত্রী ও বাকি পারিবারিক সদস্যরা হন সংসারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। এই ব্যবস্থায় স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছ থেকে গৃহকর্ম বাবদ কোনো আর্থিক মজুরি গ্রহণ করেন না, সুতরাং উদ্বৃত্ত তৈরি করেছেন কিনা বা শোষিত হচ্ছেন কিনা সেটি নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না।

তবে আমরা জানি যে, পুঁজিবাদ যত বিকশিত হচ্ছে ততোই নানা ধরনের শ্রমের পণ্যকরণ আরো বিস্তৃত হচ্ছে। পুঁজিবাদই তাই এক সময় না এক সময় 'নারী' ও 'শিশুদেরও' গৃহশ্রম থেকে বের করে এনে মজুরি ভিত্তিক শ্রমবাজারে টেনে আনবে- এটি সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আর বাস্তবে এখন আমরা সেটিই প্রত্যক্ষ করছি।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রযুক্তি বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে 'নারী'র জীবনে বাইরের দরজাটি খুলে যায় এবং তখনই সূচিত হয় আরেকটি নতুন ধরনের যুগপৎ সম্ভাবনা ও সঙ্কট। প্রথমত বুর্জোয়া অর্থনীতিতে শ্রম বাজারে প্রবেশের পর নারীকে যথোপযুক্ত বৈষম্যহীন মজুরি কখনোই প্রদান করা হয় না। যেহেতু নারীকে সমগ্র সংসারের রুটি-রুজির আহরণকারী 'কর্তা' হিসেবে দেখতে বুর্জোয়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ রাজি নয়, সেহেতু নারীর মজুরি নির্ধারণে পুরুষের মতো 'শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন খরচ'কে

হিসেবে ধরে পরিবারের মোট ভরণপোষণ মজুরি তাকে প্রদান করা হয় না; বরং তাকে পরিবারের একজন পরিপূরক আয়কারী সদস্য হিসেবে বিবেচনা করে তার স্বামী বা পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম পরিপূরক মজুরি প্রদানের রীতিই পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্র চালু রয়েছে।

সুতরাং গৃহকর্ম থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে নারী একদিকে যেমন একটু খোলা হাওয়ার আস্বাদ পেলো তেমনি অন্যদিকে প্রথমেই সে একটি অন্যায় মজুরি বৈষম্যের শিকারে পরিণত হলো। আরো বড় প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি মজুর নারীটি গৃহকর্ম থেকে মুক্তি পেলো? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, মজুরিশ্রম শেষে বাড়ি ফিরে নারীকেই আবার গৃহকর্ম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে অনুকূল পারিবারিক আবহাওয়া থাকলে অথবা শ্রম বাজার থেকে গৃহভৃত্য বা গৃহসেবা কেনার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকলে রান্না-বান্না, ঘর পরিষ্কার, সন্তান পালন ইত্যাদি গৃহকর্মগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া বা বাজার থেকে কিনে নেয়ার একটি সুযোগ কখনো কখনো উপার্জনশীল নারীর থাকে। গৃহভৃত্য রাখার অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গৃহকর্ম ভাগাভাগিটা সবসময় নাও হতে পারে। বিবাহের পর পর নর-নারী যখন পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ থাকে তখন শ্রমবিভাজনে তেমন সমস্যা হয়তো হয় না। কিন্তু বছরের পর বছর ক্লান্তিকর গৃহশ্রম কোনো পক্ষই একতরফা করতে চাইবেন না, সেটিই স্বাভাবিক। এরকম একটি আধা মুক্তি-আধা দাসত্বের মডেলেই পুঁজিবাদী পরিবার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যখন প্রায় সব নারীই গৃহের বাইরে প্রত্যক্ষ উৎপাদনমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েন এবং বাজারে গৃহকর্মের সাহায্যকারীর শ্রমও যখন ক্রমশ দুর্লভ হয়ে পড়ে তখন আস্তে আস্তে নারীর জীবনে 'দ্বৈত শ্রমের' বোঝাটি ভারি হয়ে চেপে বসে এবং সৃষ্টি হয় একটি হতাশাজনক অবস্থা। তখন নারী ও পুরুষ উভয়ই অর্থনীতির উৎপাদনমূলক শাখায় উপার্জন করার পর ঘরে এসে ঘরের প্রয়োজনীয় কাজগুলো কে করবেন সেটি নির্ধারণের সমস্যার সম্মুখীন হয় পরিবার। তখনই দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজগুলো বর্তাচ্ছে নারী পার্টনারের ওপর। এক্ষেত্রে সচরাচর পুরুষদের যে যুক্তিটি দেখানো হয় তা হচ্ছে- 'তুলনামূলক দক্ষতার যুক্তি'। বলা হয়ে থাকে যে গৃহকর্মে মেয়েরা প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিক কারণেই অপেক্ষাকৃত নিপুণ অথবা বলা হয় পুরুষরা গৃহে কাজ না করে বাইরে করলে পরিবারের জন্য যে, বর্ধিত আয়টুক করতে পারবে, নারীদের সে সুযোগ দিলে তারা তুলনামূলকভাবে ততোটুকু পারবে না। বিপ্লবী নারীবাদীদের এক্ষেত্রে পাল্টা যুক্তি যে, দীর্ঘদিন অসম শ্রমবিভাজন নারীদের বন্দি রাখার কারণেই এ ধরনের 'তুলনামূলক দক্ষহীনতার' সৃষ্টি হয়েছে। ঐ অদক্ষতার কোনো প্রাকৃতিক বা বায়োলজিকাল ভিত্তি নেই। ঐতিহাসিক ও সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা এ অসমতা ভাঙ্গতে হলে তাই আগে 'অদক্ষতা' ভিত্তিক শ্রমবিভাজনই চালু করতে হবে এবং এটি বেশ কিছুদিন চললে দেখা যাবে আস্তে আস্তে সমগ্র সমাজই ধীরে ধীরে 'মেয়েদের কাজ' বনাম 'ছেলেদের কাজ'- এ ট্রাডিশান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। অবসান হবে অসম শ্রমবিভাজনের। তখন সমাজে বা পরিবারের ভেতরে 'কাজের' ব্যাপারটি হবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দভিত্তিক, লিঙ্গভিত্তিক নয়। খুব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমিত বয়স ও লিঙ্গভিত্তিক 'স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক শ্রমবিভাজন' হয়তো তখনো টিকে থাকবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমবিভাজনটি নির্ধারিত হবে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিকভাবে। বিপ্লবী নারীবাদীরা আরো দাবী করেন যে একটি আমূল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, পুরুষদের মানসিকভাবে আমূল পরিবর্তন এবং প্রথমে কিছুটা পারিবারিক সংঘর্ষের দ্বারাই এ ধরনের পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কের উচ্ছেদ করতে হবে।

আমার ধারণা মার্কস বেঁচে থাকলে বিপ্লবী নারীবাদীদের উপরিউক্ত যুক্তিগুলো অবশ্যই স্বীকার করতেন। কারণ তার 'শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারণ' মৌল তত্ত্বের মধ্যেই উপরোক্ত বক্তব্যের পক্ষের যুক্তিগুলো সুপ্তভাবে বিদ্যমান। তবে মার্কস হয়তো উপরিউক্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে এতটুকু যোগ করতেন যে, সমাজতন্ত্রে বস্তুগতভাবে পরিবারের রূপটিই যাবে বদলে। যেহেতু সেখানে শ্রমজীবী আত্মনির্ভরশীল নর-নারীরা স্বেচ্ছায় মানবিক তাগিদে পরিবার গড়ে তুলবেন এবং পরিবারের প্রত্যেক পার্টনারের এককভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ ও সামর্থ্য নিশ্চিত থাকবে, সেহেতু কেউ জোর করে কারো ওপর অসম শ্রমবিভাজন চাপিয়ে দিতে পারবেন না। বিবাহ তখন পরিণত হবে 'বন্ধনহীন গ্রন্থিতে' এবং এর বস্তুগত ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজই তৈরি করে দিবে, কারণ সেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সুযোগ-সুবিধা সমান থাকবে। বাইরের কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে কোনো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব থাকবে না ও গৃহকর্মগুলোও অনায়েসে করার মতো নানা ধরনের সেবাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে, গৃহপ্রযুক্তিও তখন সহজলভ্য হয়ে যাবে, ইত্যাদি।

উপসংহার

একথা নারীবাদীরা বলতে পারেন যে, গৃহশ্রমের অসম বিভাজন থেকে মুক্তির ব্যাপারটি সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে একটি সমস্যা এবং এর মূল ভিত্তি হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক শ্রমবিভাজন এবং তৎপ্রসূত মূল্যবোধ। তাই এমন সমাজতান্ত্রিক সমাজ দেখা যেতে পারে যেখানে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধই প্রবল এবং মেয়েদের উপর দ্বৈত শ্রমের বোঝা চেপে বসে রয়েছে। আবার বিপরীতক্রমে এমন আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজও দেখা যতে পারে সেখানে পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে, গৃহশ্রমও পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে বিধায় গৃহের ভিতরে নারী-পুরুষ কাজের সীমিত ভাগাভাগিটা যথেষ্টই সুষম হয়ে গেছে। 'পিতৃতন্ত্রমুক্ত আধুনিক পুঁজিবাদ' তাহলে কি 'সমাজতান্ত্রিক পশ্চাৎপদ সমাজতন্ত্র' থেকে অধিকতর উত্তম নয়? হয়তো এ প্রশ্নের উত্তরে মার্কসের আধুনিক অনুসারিরা বলবেন 'সামন্তবাদী পশ্চাৎপদ সমাজতন্ত্রের' চেয়ে 'আধুনিক পুঁজিবাদ' অবশ্যই কম মন্দ; কিন্তু এ উভয় ধরনের মন্দের চেয়ে বেশি উন্নত হচ্ছে 'সাম্যবাদ অভিমুখী আধুনিক সমাজতন্ত্র'। তবে 'কম মন্দটা' আগে করে তারপর আমরা 'ভালটায়' যাবো, না কি এক লাফেই 'ভাল'টায় পৌছানো সম্ভব- তা নিয়ে এর পরেও অবশ্যই বিতর্ক থাকতে পারে এবং বিতর্ক তো আছেই! এ বিদ্যমান পটভূমিতে বর্তমান নারী আন্দোলনে আমরা তাই পরস্পর বিরোধী তিনটি ধারার সাক্ষাৎ পাই: উদারনৈতিক

আধুনিক এলিট নারীবাদী ধারার অনুসারিরা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আধুনিক পুঁজিবাদকে তাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করে থাকেন। পক্ষান্তরে 'সামন্তবাদী সমাজতন্ত্রীরা' পিতৃতন্ত্রের ইস্যুতে নীরব থেকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই প্রধান সংগ্রাম বলে বিবেচনা করেন। এ দুইয়ের বাইরে একটা ক্ষীণ প্রকৃত মার্কসবাদী নারীবাদী ধারার আন্দোলনও রয়েছে; যারা একই সঙ্গে 'পিতৃতন্ত্র' এবং 'পুঁজিতন্ত্রের' বিরুদ্ধে দ্বৈত সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষপাতী। সম্ভবত শেষের এ ধারাটিই 'মার্কসবাদ ও নারীবাদের অসুখী বিবাহের' অবসান ঘটিয়ে একটি 'প্রগতিশীল মিলনের' দিকে নারী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। ছিনিয়ে আনবে নারীর জন্য সার্বিক মুক্তি– ঘরে-বাইরে দুই ক্ষেত্রেই মুক্তি। পিতৃতন্ত্র এবং পুঁজিতন্ত্র দু'ধরনের শোষণ থেকেই মুক্তি।

নারী ও শিশু, জীবনের শেকড়

জুবাইদা গুলশান আরা*

সদ্য ২০০৭ সালে আমরা নানা রূপের নানা পর্যায়ের যুদ্ধ করছি। পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর তাণ্ডব, নিষ্ঠুরতা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় বদলে দিচ্ছে আমাদের সব সাজানো চিন্তা র ফসল। আমরা যা করতে চাই, তা পারি না। জীবনের অপচয় রোধ করার যে যুদ্ধ চলছে, তা আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে জীবন জাগরণে নারীকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠা, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঘোষণা। বিশ্বের সমাজ এক একটি পর্যায়ে অনুভব করেছে, বদলাতে হলে প্রচলিত কূপমণ্ডূকতার চাই অবসান। সমাজ বলে এসেছে, নারীর চেতনা, সম্মানজনক অবস্থান, পুষ্টি, মাতৃত্ব এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু নীতি নিতে হবে। তার সঙ্গে আমূল বদলাতে হবে সঙ্কীর্ণ ধ্যান ধারণা। সুদূর অতীত থেকে নারী পুরুষের মাঝখানে এক অদৃশ্য দেয়াল সমাজ কাঠামোকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, শুধু তাই নয়, বিচিত্র এক স্বার্থপরতায় সমাজ আবদ্ধ। ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস, জাতিসংঘের জাগ্রত চেতনার প্রতিবিম্ব নারী দিবস, নারী দশক, অতিক্রম করে আমরা সেই আবদ্ধতার নিগড় ভাঙ্গতে চেয়েছি মানুষের অধিকার। আসলে, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, কন্যাশিশুর প্রতি উপেক্ষা, মানুষ হিসেবে অধিকার হরণ প্রভৃতি এসেছে যুগ যুগ ধরে নিঃশব্দে। নারী কৃষিকাজে, গৃহকাজে, শ্রমদানে, শিশুর জন্মদান এবং সবকিছুর রক্ষনাবেক্ষণ করে এসেছে দায়িত্ববোধ থেকে। এর মধ্যে সে আপনার .....। বিশ্ব মানব সমাজ তাকে গ্রহণ করেছে প্রয়োজনের সঙ্গী হিসেবে, সহজ অধিকারে। নিঃশব্দে এ দাসত্ব নারী বহন করেছে যুগ যুগ ধরে।

কল-কারখানা, ঘরের কাজসহ সর্বত্র নারী ছিল প্রতারিত। মানুষ হিসেবে নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটে বিংশ শতকের প্রারম্ভে। নারীকে সইতে হয়েছে পুরুষের ইচ্ছের চাপ, শারীরিক অত্যাচার। এই নিঃশব্দ বলয় কেটে বেরিয়ে আসতে কেটে গেছে কয়েকটি দীর্ঘ শতাব্দী। আগামী বছর পূর্ণ হবে নারীর স্বাধীন সত্ত্বার যুদ্ধ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একশত বছর। এই দীর্ঘকাল নারীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে পা টিপে টিপে। নারীর বিরুদ্ধে সমাজের প্রতিটি অন্যায়কে রোধ এবং প্রতিরোধের গোড়া পত্তন ঘটে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯২ এর মধ্যে। মানবাধিকার আইনে জাতিসংঘ নারীর মানবাধিকারকে নিশ্চিত করেছে কিন্তু কার্যকারিতা পায় নি। বিশ্বে গড়ে উঠেছে নারী নেতৃত্বের শক্তি। মেক্সিকো, ভিয়েনা, চীন ও অন্যান্য দেশে নারীর অধিকার নিয়ে সম্মেলন হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মপরিচয় নিয়ে এ যুদ্ধ নারীকে পৃথিবী মোকাবেলা করার সাহস দিয়েছে। কিন্তু এখানে প্রথম অনুভবটা কি হওয়া প্রয়োজন? একটি দেশের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি যেমন পূর্বশর্ত, তেমনই আত্মসামাজিক উন্নয়নে নারীর শক্তিকে তার নির্দিষ্ট স্থান দেওয়াই মূল চালিকা শক্তি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষা, সচেতনতা, পুষ্টি এবং পারিবারিক বন্ধনের মূল ধারণা। পরিবারের মধ্যে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এসকল ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা যেখানে চর্চা হয় না, সেখানে নারী এবং শিশুর বিপন্নতা কঠিন অবস্থানে রয়েছে। অনেক সাফল্য সত্ত্বেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এখনও শিশু মৃত্যু, জন্মকালীন মাতৃমৃত্যু সম্পূর্ণ বিপদ রেখা পার হয় নি। প্রতিদিন সভা, সেমিনার, বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু অন্ধকার এখনও নিঃশব্দ অপেক্ষায়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণের সনদ (CEDAW)। ১৬০টি, পরবর্তীতে ১৭৫টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে কার্যক্রমের অংশীদার হয়েছে। বাংলাদেশ এই দলিলে স্বাক্ষর করে ১৯৮৪ সালে। এই সনদের অধীনে নিশ্চিত করা হয় যে, নারীর দীর্ঘ অবদান, পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে সমতা নির্ধারণ, নারীর শ্রম ও ত্যাগের স্বীকৃতি প্রভৃতি। অর্থাৎ দেশে দেশে সরকারের রুলস অব বিজনেস অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় অনুন্নত সমাজ, গ্রামীণ পরিবেশের জন্য উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের সরকারগুলো বিভিন্ন সময়ে এ কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের আওতায় রেখে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আমরা জানি যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রথা, HIV/AIDS ও শিশু পাচার রোধ এর মতোই কঠিন দায়িত্ব, যা একটি দেশের গভীর প্রয়াসকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। নারী কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ড এক বিশাল বিষয় ও কর্মক্ষেত্র। National plan of Action এর আওতায় বিভিন্নভাবে

* চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

নারীর অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিভাগ, সংস্থা ও অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিগত দশ বছরে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি, শিক্ষা ক্ষেত্রে উপবৃত্তি, এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নির্যাতনের নানা ছদ্মবেশকে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে এসেছে এক নতুন প্রচেষ্টা।

অর্থনৈতিক মুক্তি যেকোন শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। সে দিকে নারীর সমবায় প্রবণতা, প্রকল্প খনন, কর্মজীবী নারীর আবাসন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তাকে আমরা লক্ষ্য করছি। বেইজিং প্লাস প্রোগ্রামে ১৯৯৫ সালে যে সমস্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, সেই বিষয়গুলো এখন সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। 'নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের কোন ক্ষমা নেই' বলা হয়েছে এসকল সনদ ও অঙ্গীকারে। প্রকৃত চিত্র কিন্তু একেবারে ভিন্ন। বয়স্কা নারী হন পরিবারে উপেক্ষিত। মায়ের নিজের সম্পত্তি মাঝে মধ্যে হয়ে দাঁড়ায় তার মৃত্যুর কারণ। সংবাদপত্রে সে চিত্র দেখে আমরা শিউরে উঠি। শরীয়া আইন এবং ফতোয়ার ছদ্ম আবরণে অসম বিবাহ, নির্যাতন ও পাচার, অনিচ্ছুক মাতৃত্ব, শিশুহত্যা হঠাৎ করেই যেন বেড়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকেই শাস্তি এড়িয়ে যাবে চাতুরীর সঙ্গে।

আমার বলতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু নির্মম সত্য এই যে, এই সামাজিক ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয় ভায়োলেন্সে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা যুক্ত হয়ে পড়েন। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে ভাই বা শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়রাই অসহায় বিধবার জন্য বিপদজনক হয়ে ওঠেন। বেগম রোকেয়া তার বিশ্লেষণে এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বলা যায়, সে সমস্যার বিপরীতে সঙ্গত আচরণ খুব উদার পরিবার ছাড়া কমই লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে আরও একটি দিক চোখে পড়ে। তাহলো ব্যক্তিত্বের সংঘাত। নারী অধিক সফল হলে, দক্ষ হলে, তিনি হয়ে ওঠেন অনেকেরই শত্রু। কর্মক্ষেত্রে তো বটেই, ঘরেও তার সাহসিকতা, কর্মদক্ষতার জন্য বক্র কটাক্ষ শুনতে হয়। হঠাৎ করে অতি আপনজনও হয়ে ওঠেন কঠোর সমালোচক। এগুলো এমন মানসিক যন্ত্রণা, যার কোন বিচার হয় না, চাওয়াও যায় না।

সবচেয়ে বড় কথা, নারী একটি পূর্ণাঙ্গ মানব সম্পদ, সে বিষয়টি মর্যাদার সঙ্গে গ্রহণ করা আজও সম্পন্ন হয় নি। তার জন্য সামনে অনেক কাজ। তার লক্ষ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

অতি সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখলাম, ইউনিসেফ, সেভ দ্য চিলড্রেনসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান সফল একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি বাস্তব সমস্যার কথা বলেছেন। তাহলো "Breaking through the ice." এই ব্রেক থ্রু হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য। অনেক সময় আমরা বলি, Problem Invisible. কিন্তু অসহায় এসব শিশুদের জন্য আমাদের উচিত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসা। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসম সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি অসহায় শিশু, অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু এবং কর্মজীবী শিশু আজকের জন্য না হলেও ভবিষ্যতের বিশাল জনগোষ্ঠীর অংশীদার হবে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, ২০০০ সালে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে ৫৪টি বেসরকারি সংস্থা একত্রিত হয়ে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালন করে। এর ফলে বিষয়টি পায় ভিন্ন মাত্রা। আজকের কন্যাশিশুই আগামীর নারী এ ধারণাকে মূল্যায়ন করে ১৯৮৬, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে যথাক্রমে ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনগুলোতে ১৯৯০ সালকে সার্ক কন্যাশিশু বর্ষ হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৯০ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ১৯৯০-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কে সার্ক কন্যাশিশু দশক হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য শিশু বিকাশ, শিক্ষা, উন্নয়ন বিষয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ভূমিকাও অসাধারণ। ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। ইউনিসেফ, শিশু অধিকার ফোরাম, সেভ দ্য চিলড্রেন ও অন্যান্য একাধিক প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য কাজ করে চলেছে।

মনে রাখা দরকার, শিশুর কথা যখন ভাবি, তখন কর্মজীবী, ভবঘুরে এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের একটি বিরাট সংখ্যা রয়েছে, যারা এদেশেরই নাগরিক। তাদের কথা আমাদের ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র সহায়ক শক্তি, একত্রিত বা সমন্বিত কর্ম মাধ্যমগুলোর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে সারা দেশের শিশুর অবস্থা জানা সম্ভব হবে। এদেশে এমন একসময় ছিলো, যখন জন্মনিবন্ধন বা গ্রামীণ বিবাহে রেজিস্ট্রেশন করার প্রচলন ছিলো না। সময়ের বিবর্তনে আজ তা সম্ভব হয়েছে। এখন এই দীর্ঘ ক্লান্তিকর জীবন পরিবীক্ষণে আমরা কতটুকু কি করতে সক্ষম হয়েছি, অথবা ব্যর্থ হয়েছি, তার মুখোমুখি হিসাব নিকাশের সময় হয়েছে। একটি জাতিকে সাফল্য অর্জন করতে হলে অনেকগুলো বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরেই বিশ্ব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। ধীরে ধীরে ক্ষুধা, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, অশিক্ষার সঙ্গে যুদ্ধে তার সামনে খুলে যায় সম্ভাবনার দুয়ার। শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি, গার্মেন্টস ক্ষেত্রে নারীর অবদান, তাকে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়। আজ অবশ্যই সবার জানা প্রয়োজন যে, নারীর জন্য সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা। অতিরিক্ত না হলেও বলতে পারি, সমাজে, জাতির কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব আজ স্বীকৃত সত্য।

তবে এ কথা কখনোই ভুলে গেলে চলবে না যে, এখনও মিডিয়ার মাধ্যমে কন্যাশিশু হত্যা, নির্যাতন এবং কিশোর অপরাধ, যৌন নিপীড়ন আমাদেরকে পীড়িত করে। ইদানিং কিশোর ও শিশু হত্যা, নারী দেহের অবমাননা যেন আমাদের কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারে না। দেশের রাজনৈতিক অসততা, অর্থ লোলুপতাও এর জন্য দায়ী বললে বাড়িয়ে বলা হবে না।

তাহলে শেষ পর্যায়ে আমি যে আশার কথা বলছি তাহলো, শুধু পরিবারের গোড়াপত্তন ও চিন্তার পরিবর্তন সমাজ দেহের এ পচনকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখেছি, পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু নারীর জন্য আমরা গোটা দেশ কি করছি? সরকারের নীতি এবং মনোভাব এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখছে। প্রাইমারি স্কুলগুলোতে নারীর চাকুরি প্রাপ্তি, গ্রামীণ সমাজে নারীর শ্রমদান এসবের পাশাপাশি যা প্রয়োজন তা হল "গ্রামীণ" কর্মকাণ্ডে নারীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য প্রয়োজন।

আমরা যদি Hand Book on Gender Equality Planning Tools বিস্তৃতভাবে দেখি, তবে দেখবো, লিডারশীপ অর্জন করার পথে অনেক বাধা এখনও আছে। তার জন্য প্রয়োজন

১. Advisory Group,

২. Ensuring of equal of women in all Spheres of development, including access to information, skills, resources and opportunities,

৩. Vocational and technical training especially in non stereotypical, nontraditional areas,

এরকম বিশেষ সহায়ক কর্মপদ্ধতির পাশাপাশি নিরাপত্তা, আইনি সহায়তা এবং কোটা পদ্ধতির বিষয়টিও মনে রাখতে হবে।

শিশুরা সবাই আমাদের আশার আলো বয়ে নিয়ে এসেছে। সামাজিক অবস্থান যা-ই হোক, তাদের বিষয়ে অবহেলা কাম্য নয়। বাংলাদেশ তার দীর্ঘ পথযাত্রায় শিশুর জগতকে শিশুবান্ধব করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যে 'উটের জকী'র জীবন থেকে মুক্ত করে আসা, শিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক প্রয়াস বিশালতা অবশ্যই সুখের বিষয়। তবুও প্রশ্ন ওঠে শ্রমজীবী শিশুর, বঞ্চিত জীবনের। বাংলাদেশে রয়েছে জাতীয় শিশু নীতি। সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মকাণ্ড রয়েছে বছরব্যাপী। শিশু অধিকার কমিশনের প্রশ্নটিও উঠে এসেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে।

জাতিসংঘ সনদের গর্বিত অংশীদার আমাদের দেশ। এত রক্তপাত এত বেদনার ফলে যে স্বাধীন দেশের জন্ম, তাকে বর্তমান পৃথিবীর যোগ্য অংশীদার হতে হবে। কিন্তু তার জন্য চাই সমাজ ও সরকারি প্রয়াসের সঙ্গে বন্ধু দেশসমূহ, গণমাধ্যম ও বিশ্ব নেতৃত্বের সহযোগিতা। আমরা কাজ করতেই চাই। এখন প্রয়োজন শুধু human friendly শব্দটির পূর্ণ ব্যবহার। অর্থাৎ Women friendly, Children friendly and life friendly হওয়ার।

আমি আশা করি। স্বপ্ন দেখি, তবে সে স্বপ্ন বাস্তবেরই অংশ। কর্মের সঙ্গেই তার আত্মিক যোগ। আমাদের কর্ম দেশকে গড়ে তুলুক, নারীকে দিক তার প্রত্যয়। শিশুকে দিক আস্থা ও বেড়ে ওঠার আনন্দ। তার জন্য অবশ্যই আমরা প্রস্তুত। যাত্রা যত কঠিন হোক, কিছুতেই থামা চলবে না। এটিই অমোঘ সত্য।

কন্যাশিশুর দেখা শৈশব

জোবাইদা নাসরীন*

আমাদের বাসায় সবচেয়ে ছোট শিশু আদৃতা। আমার বোন চাকরিজীবী হওয়াতে জন্মের পর থেকে আমাদের বাসাতেই তার বেশিরভাগ সময় কাটানো। আমার মা'র চেয়ে বাবার সঙ্গেই তার সখ্যতা বেশি। সমাজে সচরাচর প্রচলিত ধারণা আছে যে, 'মেয়ে শিশুরা একটু শান্ত হয় এবং ছেলে শিশুরা বেশ দুষ্টু হয়'– আদৃতা ছোটবেলা থেকেই স্বভাবগতভাবে সমাজের এই ইমেজ ভেঙ্গেছে। বড় ভাইকে বড় সাইকেল দিয়েছি বলে তাকেও বড় সাইকেলেই দিতে হবে– এই জেদ ধরে, শেষ পর্যন্ত আমাদের বাধ্য করেছিল ওর জন্য বড় সাইকেল কিনতে। যদিও দীর্ঘদিন সে সেটি চালাতে পারে নি।

*

খুব ছোট বয়স থেকেই তার সঙ্গে আমার বাবার খুব ভাব। সে বাবার হাতে খায়, বাবার সঙ্গেই ঘুমায়। এই নানা-নাতনীর সম্পর্ক নিয়ে আত্মীয়-স্বজনরা চিরপরিচিত নানা ধরনের হাসি ঠাট্টা করে। আদৃতা এর কিছুই বুঝতে পারে না। সেও মজার মজার উত্তর দেয়। এক বাড়িতে বেড়াতে এসে আদৃতা রাতে তার নানা ভাইয়ের জন্য কেঁদে উঠে। কারণ সে বায়না ধরে নানা ভাইয়ের সঙ্গে ঘুমানোর। কিছুতেই থামাতে না পেরে আমার মামী তাকে বলে (যেহেতু সে নাতনী), 'তুই ব্যাটা মানুষের সঙ্গে ঘুমাস?' আদৃতার মুখটি কালো হয়ে যায়, কিছুই বলে নি সেদিন। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে সে আমার মা অর্থাৎ তার নানীকে গিয়ে বলে, 'নানুমা, নানা ভাই কি ব্যাটা মানুষ? ব্যাটা মানে কি?' আমার মা তখন তাকে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করে, 'ব্যাটা মানে হলো ছেলে।' কিন্তু আদৃতা বুঝতে চায় না, তার অতি প্রিয় নানা ভাই কি করে ছেলে হয়, সেতো তার নানা ভাই। আমি ধরতে পেরেছিলাম সেই নির্ভেজাল সময়টিকে, যেখানে আদৃতার দুই বছরের জীবনে মেয়ে-ছেলের কোন ধারণা জন্মায় নি।

আদৃতার বড় হওয়া আমি খুব কাছ থেকে দেখি। আমি দেখতে থাকি, কোন বয়সে কিভাবে সে সমাজের লিঙ্গীয় পরিচয় বুঝতে শিখছে। বিভিন্ন বিষয় শুনে, টিভিতে বিভিন্ন বিষয় দেখে সেই আদৃতা আমাদের নানা প্রশ্ন করে। তিন বছর বয়সেই হঠাৎ করে সে একদিন তার বাবাকে বলে, 'বাবা আমাকে বিয়ে দিতে গেলে যৌতুক দিতে না পেরে তুমি কি আত্মহত্যা করবে?' সেই কথা শুনে দুটো কারণে আমরা অবাক হই, প্রথমটি আত্মহত্যার মত একটি কঠিন শব্দ তার মুখে উচ্চারিত হতে দেখে, অন্যটি হল তার জিজ্ঞাসা শুনে। আমার মা তাকে বললো, তোমার জন্য কেন যৌতুক দিতে হবে?' সে তখন আমাদের আরও কিছুটা অবাক করে উত্তর দিলো, 'আমি যে মেয়ে'। পরিবেশটি হালকা করার জন্য আমার বোন কিছুটা স্ব-উদ্যোগী হয়েই বললো, 'টেলিভিশন দেখে দেখে ও এগুলো বলছে। আমি অবাক হই এই ভেবে যে, কিভাবে সেই বাচ্চা মেয়েটি নিজেকে আবিষ্কার করা শুরু করলো 'মেয়ে' হিসেবে?

সেই আদৃতা একটু একটু করে বড় হয় এবং তার বিভিন্ন প্রশ্ন, তাকে ঘিরে আমরা চিন্তা কিংবা দুঃশ্চিন্তা যা-ই বলি না কেন সেটিকে বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আদৃতা আরেকটু বড় হয়, যখন চার বছরে পড়েছে তখন থেকে আদৃতা আমার বাবার কাছে টুকটাক পড়তে যায়। তার বড় ভাইটিও আমার বাবার কাছেই পড়ে। একদিন পড়া অবস্থায়ই আদৃতা জিজ্ঞেস করলো, 'নানা ভাই ছেলেরা নাকি মেয়েদের এসিড মারে, তুমি আর ভাইয়াতো ছেলে, তোমরা কি আমাকে এসিড মারবে? আমার বাবা বললেন, 'না না তা কেন? আমরা কেন তোমাকে এসিড মারবো?' সে আরও যোগ করে বলে 'নানা ভাই এসিড মারলেতো আমার মুখটা পুড়ে যাবে, আমার চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।' এসব কথা যে সে ভয়ার্ত কণ্ঠে এবং আতঙ্কিত চোখে বলেছে, সেটিও লক্ষ্য করেছেন আমার সত্তরোর্ধ্ব বাবা। বাবা আমাদের ডাক দেয়। আদৃতা কোথাও কোন ধরনের ভয় পেয়েছে কিনা সেটি জানতে চায়। আমরা এর জবাব দিতে পারি না। তবে শুধু ধরতে পারি একটি মেয়ে শিশু হিসেবে আদৃতার বেড়ে উঠার বোধটিকে।

কেননা আমাদের সমাজে আদৃতার মতো পাঁচ বছরের একটি শিশুও জীবনের সেরা ভয়ের শিকার হতে পারে বাচ্চা বয়সেই। আমরা একটি ছোট বাচ্চা মেয়েকে বুঝতে শিখাই এই পৃথিবীর মানুষ হলেও তোমার জন্য এই পৃথিবী নয়, তোমার জন্য রয়েছে, এক পৃথিবীর মধ্যে আরেক পৃথিবী। নিজেরা না শিখালেও সমাজের আশেপাশের ঘটনা প্রবাহে সে নিজেই বুঝে যায়, তার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তার বড় হওয়া স্বস্তির হয় না, বরঞ্চ শঙ্কা এবং এক অনিরাপত্তাজনিত আতঙ্ক নিয়ে শুরু হয়। আমরা সেই কন্যাশিশুটিকে সব সময় চোখে চোখে রাখি। অবচেতনভাবেই পুরুষ আত্মীয়টি থেকে তাকে দূরে দূরে রাখা হয় তাকে।

আমরা সেই সমাজ প্রত্যাশী, যে সমাজে একটি কন্যাশিশুও এই রকম আতঙ্ক নিয়ে, হাজার প্রশ্নের ঝাঁপি নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে যাবে না। হাজারো ভয়ের শৃঙ্খলে বাধা পড়বে না তার স্বপ্নের গুড়িটি।

পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের বানিজ্যিকীকরণ

ZcZx mvnv*

bvMwiK Av‡jv Avi cÖvK…wZK AÜKv‡ii gv‡S GB gnvbMixi †Kvb GK dzUcv‡Zi Ici w`‡q wbtm½ GKRb bvix †nu‡U P‡j‡Q| †K GB bvix? AZ¨š— cwiwPZ GB `„k¨| bv, †cÖwg‡Ki Rb¨ A‡c¶viZ †Kvb †cÖwgKv †m bq| mvÜ¨ ågYiZ ga¨weË ev D”PweË cwiev‡ii †Kvb bvix †m bq| GB bvixi †k^{a}wYMZ Ae¯’vb wba©viY Kiv KwVb| KviY †m †Kvb cweÎ cwievify^{3} bq Ges †Kvb cyi“‡li ¯¿x, †g‡q ev †evb bq| mgv‡R bvix‡`i †k$^{a}$wYMZ Ae¯’vb wba©vwiZ nq cyi“‡li mv‡_ m¤ú‡K©i wfwË‡Z| AvcvZZ _vK GB we‡k-lY, Avgiv wd‡i hvB †mB bvixi Kv‡Q †h Avmbœ mš—vb m¤¢ebvi cwic~Y© wPý kix‡i aviY K‡i, mg¯— hš¿Yvi `vqfvi enb K‡i AÜKvi dzUcv‡Z †nu‡U †eov‡”Q †mB

* নারীবাদী লেখক ও জেন্ডার বিশেষজ্ঞ, প্লাজ-২ প্রকল্প এবং জাতীয় ও দক্ষিণ এশিয়া নারী আন্দোলন কর্মী

cyi“‡li mÜv‡b, †h cyi“l hyM hyM a‡i wb‡Ri eûMvwgZv PwiZv_© Kivi nvwZqvi wn‡m‡e Zv‡K e¨envi K‡i P‡j‡Q| †h cyi“l wb‡Ri cwZZ †Pnviv Avovj Kivi Rb¨ Zv‡K cwZZv bv‡g msÁvwqZ K‡i‡Q|

এই নগরীর রাতের ফুটপাত বা অলি-গলির অত্যন্ত পরিচিত এই দৃশ্যপট। অনেকের কাছে মনে হতে পারে, এতে বিস্মিত হওয়ার কি আছে? এই বিষয় নিয়ে এত কথার অবতারণার দরকারই বা কি? যে যাই বলুক বা যত সাধারণ, দৈনন্দিন ঘটনাই হোক, সেদিন ফুটপাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা গর্ভবতী সেই নারীকে দেখে আমার মস্তিস্কের কোষে হঠাৎ এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই মুহূর্তে প্রথমেই মনে হয়েছিল, এই নারী যদি কোন মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত পুরুষের আইনসম্মত স্ত্রী হত, তাহলে কি তাকে গর্ভবতী অবস্থায় অন্ধাকারে অর্থোপার্জনের জন্য এভাবে হাঁটতে হতো? অবশ্যই না। বরং পুরুষের বংশ রক্ষার ধারক-বাহক হিসেবে কোন এক সুসজ্জিত শয়নকক্ষে তার স্থান হতো। চারপাশে থাকতো দামী খাবার ও ঔষধের ছড়াছড়ি।

অন্যদিকে তার সন্তানের পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা আসন্ন সন্তানটি যেন ছেলে হয় এই কামনায় দু'হাত তুলে প্রার্থনায় রত থাকতো। হয়তো এই পরিবারের কর্তব্যপরায়ণ পুরুষটিই অন্ধকারে অপেক্ষারত সেই দেহজীবী নারীর সন্তানেরও জনকা। দু'জন নারী একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই পুরুষের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। অথচ দু'জনের পরিচয় ভিন্ন। শুধুমাত্র পুরুষের ইচ্ছা ও স্বার্থের ভিত্তিতে দু'জন নারীর সামাজিক অবস্থান ভিন্ন হয়ে যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অভিধান অনুযায়ী কখনও পতিতা, কখনও দেহজীবী বা পুঁজিতান্ত্রিক প্রগতিশীলতায় যৌনকর্মী নামে এদেরকে চিহ্নিত করা হয়। মাঝে মধ্যেই এদের নিয়ে বেশ হৈ-চৈ, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, মানবাধিকার সংস্থার ব্যস্ততা দেখা যায়। তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজ বেশ কিছুদিন উত্তপ্ত সময় কাটানোর সুযোগ পান। কিন্তু যা কিছু করা হোক না কেন সবটাই এই নারীদের কেন্দ্রবিন্দু করে। অথচ যে পুরুষ যুগ যুগ ধরে বিকৃত কামনা চরিতার্থ করার জন্য এই পেশা টিকিয়ে রেখেছে সেদিকে কেউ ভুলেও দৃষ্টিপাত করেন না। এমন কি মূল কারণটিও বিশ্লেষণ করেন না। বরং এই পেশাকে এবং দেহজীবী নারীদের বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসেবে তুলে ধরা হয়। অথচ সামগ্রিক অর্থে নারী-পুরুষ সম্পর্কের অসম ও অসুস্থ রূপের এটি একটি দিক মাত্র। নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহারের ধারাবাহিকতার একটি চরম প্রকাশ হচ্ছে Prostitution। বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি যার ধারক-বাহক।

যে মুহূর্ত থেকে পুরুষতান্ত্রিক ইতিহাস শুরু হয়েছে তখন থেকেই পুরুষের বহুগামিতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে মানুষের সম্পর্কের অনেক বদল ঘটেছে। সমাজে অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটলেও পুরুষের বহুগামিতা চর্চার ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে নি। বরং বিভিন্ন তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একে সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে আইনসম্মত রূপ। এই বিষয়টির উৎস অনুসন্ধানের জন্যই এই লেখা। যদিও এই অনুসন্ধানের সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে মহানগরীর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নারী।

ইতিহাস কি বলে?

পুরুষতন্ত্র বা নারীর অধঃস্তনতার ঐতিহাসিক কারণ অনেকেরই জানা আছে। বহুগামিতা কি পুরুষতন্ত্রের একটি প্রকাশ? নাকি এই ধরনের বিকৃতির জন্য বিশেষ কোন কারণ দায়ী? তাছাড়া পুরুষদের মধ্যেই বা কেন এর জন্ম হলো। এর কি কোন আলাদা প্রেক্ষিত আছে? নাকি পুরুষতন্ত্রের উৎসের সঙ্গেই এটি জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। অনেক নারীবাদী গবেষক ও নৃতাত্ত্বিক নারী শোষণের ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করলে এর ঐতিহাসিক কারণ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

শিকার-সংগ্রহের যুগে শিকারী পুরুষ বনে জঙ্গলে ঘুরে পশু শিকার করেছে। যার ফলে পশুদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পুরুষের হয়েছে। এই পর্যবেক্ষণই আরো তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়েছে পশুপালক যাযাবর সময়ে। এই পর্যায়ে পুরুষ দেখেছে একটি ষাঁড় কিভাবে অনেকগুলো গাভীকে সন্তান সম্ভবা করতে পারে। এই পর্যবেক্ষণ পুরুষকে তার নিজের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। যার ফলে পশুপালক যাযাবর অর্থনীতির যুগে দুর্বল পশুগুলো মেরে ফেলে শক্তিশালী পশুগুলোকে রাখা হতো। এই সময় থেকেই একদিকে যেমন পশুদের মুক্ত বন্য যৌন সম্পর্কের অনুকরণে জবরদস্তিমূলক যৌন সম্পর্কের উদ্ভব ঘটে। তেমনি অন্যদিকে একজন পুরুষের জন্য অসংখ্য নারীর প্রচলন শুরু হয়। এভাবে নারীহরণ, ধর্ষণ ও হারেম প্রথার শুরু হয়। পিতৃসূত্রীয় উত্তরাধিকার প্রথা এই সময় থেকেই স্পষ্ট রূপ পেতে থাকে। পশুপালক যাযাবর অর্থনীতির একই যুক্তিতে নারীকেও অস্থায়ী যাযাবর সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। যাযাবর অর্থনীতির বদল ঘটেছে, পৃথিবীর ইতিহাস অতিক্রম করেছে অনেকগুলো অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্ক। কিন্তু অনেক পুরুষ আচরণ ও সংস্কৃতিগতভাবে সেই পশুপালক যাযাবর সমাজের অবস্থানেই রয়ে গেছে। পশুর আচরণ থেকে আত্মস্থঃ করার অভ্যাস মজ্জাগত করেই পুরুষ নারীর যৌনতা ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতার ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে (Patriarchy and Accumulation On a World Scale by Maria Mies, P.63)।

বহুগমনের সামাজিক স্বীকৃতি

একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সমাজ পশুপালনের ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে সেখানে বহুগমনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি জোড়ালো ভিত্তি পেয়েছে। যেমন আরব রাষ্ট্রসমূহ, হারেম এসকল দেশেই প্রচলিত। যা এখনও টিকে আছে। এই সমাজগুলো ইতিহাসের এক পর্যায়ে শস্য উৎপাদনের চেয়ে পশুপালনের ওপর বেশি নির্ভর করেছে। যদিও বহু বিবাহ বিভিন্ন সমাজেই স্বীকৃত। একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক বিবাহ, বহুগমনের একটি সামাজিক ও আইনগত রূপ মাত্র। পুরুষের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য ঘরের ভেতর স্ত্রী হিসেবে এক বা একাধিক নারীর প্রয়োজন যে নারীর পুনরুৎপাদন ক্ষমতার ওপর স্বামী নামক পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার। আবার ঘরের বাইরে পুরুষ এক নারী গোষ্ঠী তৈরি করেছে, তার শারীরিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য। যার নাম দেহজীবী নারী। যদিও এই নারীদের ওপর একজন পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার নেই। সর্বকালে সর্বদেশে পুরুষের বংশরক্ষার জন্য তথাকথিত সতী নারীর প্রয়োজন হয়েছে অথচ অনেক পুরুষ নিজে কখনই সৎ থাকার প্রয়োজন অনুভব করে নি। এমনকি এই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব অর্থনীতির যুগেও পুরুষের বহু বিবাহ আইনসম্মত।

নারী কেন যৌনপেশায় নিয়োজিত হয়?

বেশির ভাগ নারী যৌন কাজ বেছে নেয় দারিদ্র্যের কারণে। আবার অনেকে পরিবারের সদস্য বা দালালের খপ্পরে পরে এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, যৌনকর্মীরা তাদের খদ্দেরদের শোষণ করে। যদিও সেটি ঠিক নয়। বাস্তব চিত্র এই যে, বিশাল অংশের নারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি লাভজনক পেশা। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ব্যাংককে শিশুযৌনকর্মীদের মাসিক মুনাফা $ ৮০,০০০ এর বেশি। অসংখ্য স্বার্থান্বেষী মহল কম বয়সী মেয়েদের এই পেশায় জড়িত করে মুনাফা অর্জন করে। ইন্দোনেশিয়াতে যৌনকর্মীদের বাৎসরিক আয় US $১.১ মিলিয়ন থেকে $৩.৩ মিলিয়ন। থাইল্যান্ডে প্রতি বছর শহর থেকে গ্রামে যৌনকর্মীরা ৩০০ মিলিয়ন ডলার যোগান দেয়, যা ঐ দেশের সরকারি উন্নয়ন বরাদ্দের চেয়েও বেশি। তবে সরকারি পরিসংখ্যান বা জাতীয় আয়ের কোথাও যৌন খাতের আয়ের কোন স্বীকৃতি নেই।

বেশির ভাগ আইন নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যৌনকর্মীদের শাস্তি প্রদানের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। লাভজনক হওয়ার কারণে যৌনব্যবসা ক্রমান্বয়ে বিশ্বব্যাপী ফুলেফেঁপে উঠেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যৌনকর্মীদের আইনগত স্বীকৃতি ও অধিকার সীমিত। এমনকি তারা তাদের খদ্দেরদেরকে নিরাপদ কনডম ব্যবহারেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। যেখানে যৌনকর্মীদের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে সেখানেই কেবলমাত্র সম্ভব কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই যৌনকর্মীদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমন একটি নীতিমালা করা যেখানে এই নারীদের মানাবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও শিশুদের যৌন পেশায় নিয়োজিত করা নিষিদ্ধ করতে হবে। কিছুদিন আগে যৌনকর্মীদের জন্য কাজ করতে ফরিদপুরের ঈদ ঘাট এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করি। যার দু'টি নিম্নরূপ:

কেস স্টাডি

সেলিনা, বয়স ২৮ বছর। বাড়ী মানিকগঞ্জের কোন এক গ্রামে। সঙ্গত কারণেই গ্রামের নাম প্রকাশ করে নি। ১৪/১৫ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মামার বাড়িতে সেলিনা বেড়াতে আসে। সেখানেই পরিচয় হয় বিজয় নামে একটি ছেলের সঙ্গে। পরিচয় থেকে গভীর প্রেম। যেহেতু এই প্রেম হয়েছিল ভিন্ন ধর্মের একজনের সঙ্গে তাই দু'জনেই বুঝতে পারে পারিবারিকভাবে এর সফল পরিণতি সম্ভব নয়। ফলে দু'জনে মিলে পরামর্শ করে পালিয়ে যাওয়ার। পালিয়ে ভারত যাবে এবং সেখানে গিয়ে বিয়ে করবে। এভাবেই একদিন সেলিনা মামার বাড়িতে বেড়াতে আসার নাম করে পারি জমায় অজানার উদ্দেশে। পেছনে পড়ে থাকে তার কৃষক পিতামাতা ও পাঁচ ভাইবোনের সুখের সংসার। বিজয় তাকে বলেছিল দৌলতদিয়া ঘাটের একটি নির্দিষ্ট স্থানে চলে আসতে, সেখানে দু'জনের দেখা হবে। সেলিনা অপেক্ষা করতে থাকে বিজয়ের জন্য। দীর্ঘক্ষণ পর বিজয়ের দুই বন্ধু এসে বলে ভাবী আমাদের সাথে চলেন। বিজয় আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে। সেলিনা সরল বিশ্বাসে তাদের সাথে দৌলতদিয়া ঘাটের একটি বাড়িতে এসে ওঠে। কিন্তু বিজয়ের দেখা পায় না। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে কেটে যায় ৩/৪ দিন। দেখা মেলে না তার কাঙ্ক্ষিত জনের। ক্রমশ সব কিছু পরিষ্কার হয়। যখন এ বাড়ির সর্দারনী মহিলা বলে, সেলিনা বিক্রি হয়ে গেছে। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পরে। বন্ধ হয়ে যায় তার ফেরার পথ। সর্দারনী তাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। ফলে কিছুতেই বের হতে দেয় না। এভাবেই সে বাধ্য হয় যৌনকর্মীর পেশা বেছে নিতে।

কিছুদিন পর সেলিনার মা-বাবা খোঁজ পেয়ে দেখা করতে আসে। মা অনেক কান্নাকাটি করলেও বাবা বলে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। সেলিনা নিজেও প্রচণ্ড অভিমানে আর ফিরে যেতে চায় নি। পরবর্তীতে সেলিনার ভাইরা বিজয়ের নামে মামলা করে। তার জেল হয়। কিন্তু সেলিনা একজন গৃহিণী, কৃষাণী বা সমাজের সুন্দর নাগরিক না হয়ে পরিণত হয় যৌনকর্মীতে। তারপর কেটে গেছে ১৪/১৫ বছর। এখন সে নিজেই বাসা ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে যৌনকাজ করে। বাধা বাবু আছে। সে খুলনায় কাজ করে। বর্তমানে সেলিনা তার গ্রামের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। মাঝে মাঝে বাড়ি যায়। বাবা মারা গেছে। গ্রামের অন্য লোকেরা জানে সেলিনার এখন বিয়ে হয়েছে, ঘর-সংসার করে। তার বাধা বাবু মাঝে মাঝে সেলিনার বাড়িতে আসে স্বামীর পরিচয়ে। সেলিনা তার ভাইয়ের সংসারে টাকা দেয়। কারণ ভাইয়েরা মাকে ভরণপোষণ দেয় না। তাই সেলিনাকেই পরিচয় গোপন করে মায়ের ভরণপোষণ করতে হয়। সমাজে তার জায়গা না হলেও দায়িত্ব থেকে রেহাই পায় নি সে।

কেস স্টাডি

Avmgvi eqm, e‡jwQj 15 eQi| †`‡L g‡b nq Kg n‡e| K_v ejvi f½x wkïmyjf| wK‡kviM‡Äi evwRZcyi GjvKvq AwZ`ªwi`ª cwiev‡ii mš—vb| msmv‡i mr gv| Afve Avi mr gv‡qi wbh©vZb mn¨ Ki‡Z bv †c‡i XvKvq P‡j Av‡m| XvKvq G‡m KZ iK‡gi KvR K‡i‡Q| wKš‘ KLbB fv‡e wb †hŠb KvR K‡i A‡_©vcvR©b Kiv hvq| GgbwK 7/8 w`b Af~³ †_‡K‡Q| wgicyi gvRv‡i wLPzix LvIqvi †jv‡f e‡m _vK‡Zv| G iKg Ae¯’vqGKw`b GK †jvK KvR †`qvi K_v e‡j gv`vixcyi wb‡q Av‡m| †mLv‡b 2000 UvKvi wewbg‡q m`©vibxi Kv‡Q wewµ K‡i †`q| GLb bvRgv GKRb ÔQyKixÕ| ÔQyKixÕ‡`i †Kvb ¯^vaxbZv _v‡K bv| KviY Zviv m`©vibxi N‡i _v‡K| Zv‡ì mg¯— Avq m`©vibx wb‡q †bq| GgbwK Zv‡`i wekªvg, LvIqv cov, mKj wKQy m`©vibx wbqš¿Y K‡i| w`‡b 12/13 Rb †jvK‡KI m½ w`‡Z nq| †ewki fvM †jvKB KbWg e¨envi Ki‡Z Pvq bv| kvixwiK AZ¨vPvi Ki‡jI cÖwZev` Kiv hvq bv| GgbwK hw` †Kvb †jvK fv‡jv‡e‡m eLwk&m †`q †m UvKvI m`©vibx wb‡q †bq| Avmgv e‡j Ò†hŠb KvR K‡iI †cU f‡i fvj Lvevi †L‡Z cvB bv| GKUv fvj Rvgv ci‡Z cvwi bv| gv‡S gv‡S g‡b nq wel LvB|Õ

GiKg Av‡iv A‡bK †KBm ÷vwW msMÖn K‡iwQjvg| hvi cÖwZwUB cyi“lZvwš¿K mgv‡Ri AwePvi, eÂbv I †kvl‡Yi cÖwZ”Qwe|

শুধুই কি পুরুষ?

পুরুষই কি শুধু যুগ যুগ ধরে শারীরিক ও মানসিক বহুগমনের চর্চা টিকিয়ে রাখার জন্য যৌনপেশাকে উৎসাহিত করছে? নারীদের কি এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা নেই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, সমাজ কখনোই নারীর বহুগমনকে স্বীকৃতি দেয় নি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবেই নারী আত্মস্থঃ করেছে সৃষ্টিশীলতা, দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সামাজিক চর্চা, ফলে বহুগামিতার চর্চা সমষ্টিগত অর্থে নারী কখনই করে নি। তবে বিচ্ছিন্ন উদাহরণ থাকতে পারে, যা গোটা নারী সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে না।

তবে একটি বিষয় সত্যি যে, নারী অনেক সময় পুরুষের বহুগমন চর্চার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। যেমন মনত্ত্বাতিক বা আর্থ-সামাজিক কারণ যাই হোক কোন কোন পরিবারের নারী সদস্যরা পুরুষের এই দিকটি দোষের চোখে দেখেন না। এই নারীরা পুরুষতন্ত্রের সুবিধাভোগী শ্রেণি। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, নারীর সহায়তা ছাড়া পুরুষতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না।

মনোজাগতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন

দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের মনোজগত গড়ে উঠেছে নারীর যৌনতাকে পণ্য করে। নারীকে অসম অংশীদার হিসেবে ধরে নেয়ার ফলেই তার দেহ ও মন কখনই এই সমাজের কাছে মর্যাদা পায় নি। তাই কাঠামোগত পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রয়োজন পুরুষের সংস্কৃতিগত উত্তরণ। বিলুপ্ত করতে হবে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা, তা না হলে পুরুষতন্ত্রের ইতিহাস কখনই মানুষের ইতিহাসে পরিণত হবে না। আর যুগ যুগ ধরে সন্ধ্যার আঁধারে দাঁড়িয়ে ঐ নারী অপেক্ষা করবে শিকারী পুরুষের জন্য। কিন্তু মানুষের সম্পর্কের এই বহুমাত্রিক বাণিজ্যকীকরণ বন্ধ করতে হলে নারী হিসেবে নয়, পুরুষ হিসেবেও নয়, মানুষ হিসেবে ঐ নারীর কাছে যেতে হবে। তার হাজার বছরের অপেক্ষার শেষে সম্মিলিতভাবে বলতে হবে, আজ থেকে শুরু হোক মানুষের ইতিহাস। এই মানবিক ইতিহাসের পথ ধরে এগিয়ে যাবে আমাদের কন্যাশিশুরা। একটি সুস্থ, সুন্দর বৈষম্যহীন সমাজের দিকে, যা কিনা আমাদের সবার একান্ত চাওয়া।

সহায়ক গ্রন্থ

1. Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale Woman in the International Division of Labour. Zed Books Ltd.-1986.
2. Marx, K and Engels, F. Selected works, Volume III, Progress Publishers, 1970.
3. কমলা ভাসীন, ১৯৯৩: পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?

এক আলোকিত মানুষের কথা

দিল মনোয়ারা মনু*

নূরজাহান বোস– অসহায়, নির্যাতিত এবং সুযোগ বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো এক নন্দিত নাম। বরিশালের উপকূলীয় অঞ্চল কাটাখালি বঙ্গোপসাগরের কোলের মধ্যে একটি গণ্ডগ্রাম। দুই হাজার পাঁচ সালেও যেখানে বিদ্যুৎ-রাস্তা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না, বন্যা হলেই ঘর-বাড়িসহ মানুষ ভেসে যাওয়ার ঘটনা ঘটত। সেই গ্রামেই জন্ম নূরজাহান- আজকের নূরজাহান বোসের। অসীম মনোবল ও দুর্দান্ত সাহসকে পুঁজি করে সুদূর আমেরিকার ওয়াশিংটনে নিজেকে সুযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। ভুলে যান নি তার উঠে দাঁড়ানোর সংগ্রামকে, নিজ দেশের সুযোগ বঞ্চিত নিপীড়িত নারীদের। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে তার ভীষণ সখ্যতা। প্রকৃতির খোলা জানালা দিয়ে তিনি নিজের দেশকে দেখেন নিরন্তর। অঙ্গীকার করেন নিজের দেশের কিছু মানুষকে আলোকিত করার। এই অঙ্গীকার থেকে তিনি গড়ে তুলেছেন 'সংহতি' নামের একটি জনকল্যাণমুখী সংগঠন, যার মাধ্যমে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন এদেশের নারী ও শিশুদের। এটি একটি অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই আলোকিত নারীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার কিছু অংশ এখানে তার নিজের ভাষায় তুলে ধরা হলো।

আমার কথা

মাত্র দশ বছর বয়সে এক জোতদারের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করা হয়। কিন্তু আমার মা বেঁকে বসেন। তিনি আমাকে লেখাপড়া শেখাবেন। ১৯৪৭ সালে আমার বয়স যখন নয় বছর, তখন মায়ের প্রবল আগ্রহে লেখাপড়া শেখার জন্য আমাকে পাঠানো হয় পাশের গ্রামে ফুফুর বাড়িতে। কিন্তু তারা লেখাপড়া শেখানোর চেয়ে আমাকে দিয়ে ঘর-সংসারের কাজই বেশি করাতেন। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর আমার মা পরবর্তীতে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে বরিশালে সৈয়দুন্নেছা গার্লস স্কুলের হোস্টেলে রেখে আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমার জীবন বদলে যেতে শুরু করল

১৯৫০ সালের দাঙ্গায় হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় এক বছর আমার লেখাপড়া বন্ধ থাকে। এ সময় পটুয়াখালীতে বোরকা পরার শর্ত মেনে নিয়ে খালার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শুরু করি। পটুয়াখালীতে নির্মলেন্দু পাঠাগার নামে একটি বিখ্যাত পাঠাগার ছিল যার বর্তমান নাম 'শহীদ স্মৃতি পাঠাগার'। এই পাঠাগারের মাধ্যমে আমার সামনে বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার খুলে যায়। আমি একে একে কার্ল মার্কস, মূলক রাজ আনন্দ, জওহরলাল নেহেরু, টমার্স হার্ডি, ইবসেন, ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত সব বই পাঠ করি, যা আমার জীবনকে বদলে দিতে শুরু করে। আমি ক্রমশ হয়ে উঠি এক আশাবাদী আলোকিত মানুষ।

রাজনীতি এবং বিয়ে

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ১৯৫৪ সালে বরিশাল শহরের তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির যুব নেতা ইমাদুল্লার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তার হাত ধরেই আমি আসি রাজনীতিতে। তখন থেকেই তার সঙ্গে আমার প্রেম এবং পঞ্চান্ন সালে বিয়ে হয়। বিয়ের মাত্র ছয় মাস পরেই এই অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবী নেতার মৃত্যু হয়। আমি তখন অন্তঃসত্ত্বা। শুরু হয় এক নতুন জীবন সংগ্রাম। বরিশালের যে হোস্টেলটি আমার লেখাপড়ার সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটি আবার নতুন করে গড়ে তুলি। সুপারের দায়িত্ব পালন করি, বেতন ত্রিশ টাকা। এভাবে চাকরি এবং টিউশনি করে ছেলেসহ আমার সংসার চলছিল। এর মধ্যে পরিচয় ঘটে আরেক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা ইমাদুল্লার বন্ধু ড. স্বদেশ বোস-এর সঙ্গে। সদ্য জেল খেটে বেরিয়েছেন তিনি। রাজনৈতিক সহকর্মী হিসেবে এক সময় তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ি। ১৯৬৩ সালে তার সাথে আমার বিয়ে হয়। বিয়েটি হয়েছিল গোপনে, কারণ তখন হিন্দু-মুসলিম বিয়েকে কেউ সহজভাবে নিতে পারতো না। স্বদেশ বোস পিআইডিইতে চাকরি করতেন। আমি বাংলায় এম এ পড়ছি। বিয়ের পর স্বদেশ বোস পিএইচ.ডি করার সুযোগ পান। ছেলেসহ আমরা কেমব্রিজে চলে যাই। সেখানে আমার বড় মেয়ে মণিকার জন্ম হয়। আবার আমার মধ্যে কাজের নেশা চেপে বসে। কেমব্রিজে গৃহিণীদের নিয়ে নিজের বাসায় শুরু করি প্লে গ্রুপ স্কুল। সেখানে প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিলাম, তারপর ফিরে আসি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমরা বিক্রমপুরের নওপাড়ায় আমার মায়ের এক ফুফুর বাড়িতে আশ্রয় নেই। সেই সময় Save the Bangladeshi Intellectual নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তারা স্বদেশ বোসকে আগরতলা নিয়ে যায়। সেখানে তিনি মুজিবনগর প্লানিং কমিশনে কাজ করেন। দু'মাস পর ছেলেকে তার ফুফু বেলা নবীর (নারী আন্দোলনের নেত্রী) কাছে রেখে দু'মেয়েসহ আমিও আগরতলায় চলে যাই। পরবর্তীতে আগরতলা হতে কলকাতায় যেতে হয় এবং সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের

*

সহায়তা করার জন্য সল্টলেকে রিফিউজি ক্যাম্পে কাজ শুরু করি। টাকা সংগ্রহ করে মনোরমা বসু, নলিনী দাস, মুকুল সেনদের মাধ্যমে বরিশালবাসী কমিউনিস্টদের বারাসাত ক্যাম্পে পাঠাতাম। দেশ স্বাধীনের পর কুষ্টিয়ার মুক্ত এলাকায় যখন আসি তখন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছি দশ-বার বছরের ছেলেরা বন্দুক হাতে আমাদের পাহারা দিচ্ছে। পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের পর ঢাকায় ফিরে আসি। এরপর উদয়ন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করি। এর মধ্যে স্বদেশ বোস এক বছরের জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি পায়। আমরা সপরিবারে আমেরিকার ওয়াশিংটনে চলে যাই। ইতোমধ্যে দেশে স্বদেশ বোসর বিআইডিএস-এর চাকরিটাও চলে যায়। আমরা তারপর থেকে স্থায়ীভাবে ওয়াশিংটনে থেকে যাই। আমার ছেলে জসীম আহমেদ অর্থনীতিবিদ হিসেবে বর্তমানে এডিবিতে কর্মরত আছে।

সংহতির যাত্রা শুরু

ওয়াশিংটনে বসবাসের শুরু থেকেই মায়ের কথা খুব বেশি মনে পড়ত। তার সঙ্গে মনে পড়ত নিজের বানে ভাসা গ্রাম ও সেখানে বসবাসকারী মানুষদের কথা। দেশের নির্যাতিত মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্থানীয়দের সহায়তায় 'সংহতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। সংহতির একাউন্ট খোলার জন্য যে পরিমাণ টাকার দরকার তাও তখন আমার হাতে ছিল না। লিন্ডা গোল্ডম্যান নামে এক বন্ধু আমাকে একাউন্ট খোলার জন্য ৫০০ ডলার দিয়েছিল।

বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় শনি-রবিবার বাজার বসানো শুরু করি। পোলাও, কোর্মা, পরোটা, কাবাব, কালোজাম, রসগোল্লা, সিঙ্গারা, পিঠা ইত্যাদি বানিয়ে চলতি পথ থেকে লোক ধরে এনে বিক্রি শুরু করি। কিছু দিনের মধ্যে মার্কিনীরা মশলার স্বাদে মশগুল হয়ে যায় এবং সংহতির পুঁজি বাড়তে থাকে। এছাড়াও গ্রীষ্মে অনুষ্ঠিত সকল মেলায় অংশগ্রহণ করে খাবার ও ফুল বিক্রি করতে শুরু করি এবং উপস্থিত সবাইকে বাংলাদেশে নিজেদের প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি। এভাবে ধীরে ধীরে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সংহতি আজ একটি পরীক্ষিত সফল সংস্থা হিসেবে ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকায় খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

টাকার পরিমাণ যখন বেশি হল তখন ঢাকায় এসে সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি সুফিয়া কামালের (আমাদের প্রিয় খালাম্মার) সঙ্গে কোথায় কিভাবে এ টাকা খরচ করা যায় জানতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন, "আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা।" আমাদের সেই টাকা দিয়েই খালাম্মার ইচ্ছানুযায়ী মহিলা পরিষদের আশ্রয় কেন্দ্র 'রোকেয়া সদন'র যাত্রা শুরু হয়। আমরা ট্রাস্ট করে মহিলা পরিষদকে এককালীন ২০ হাজার ডলার দিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত মহিলা পরিষদকে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ডলারের তহবিল দান করা হয়েছে।

নিজ গ্রামকে মডেল হিসেবে তৈরি করি

এরপর চিন্তা করলাম বাংলাদেশের কোন একটি গ্রামকে মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবো। যার অনুকরণে অন্য গ্রামগুলোও জেগে উঠবে। সেই লক্ষে কাজ করার জন্য আমি আমার কাটাখালি গ্রামকেই যথার্থ মনে করে কাজ শুরু করি। কারণ আমি আমার গ্রাম ও তার সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানি। আমার গ্রামে কাজ করে অভিজ্ঞতা হলে অন্য যে কোন গ্রামে কাজ করা আমার জন্য সহজ হবে। আমি 'স্যাপ বাংলাদেশ'-এর পরিচালক নুরুল আলমের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলি। তিনি রাজী হন এবং বিগত তিন বছর ধরে আমরা বরিশালের রিমোট আইল্যাণ্ডে কাজ করছি। আমি প্রতি বছর সেখানে যাই। ২২৫ জন মেয়ে নিয়ে কাজ শুরু করেছি আমরা। প্রথম বছর শুধু সচেতনতা বৃদ্ধি, বয়স্ক শিক্ষা, নারী অধিকার, মানবাধিকার, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ মাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দ্বিতীয় বছরে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রদান, উন্নত ধরনের বীজ প্রদান, হাঁস মুরগী পালন, গাছ লাগানো ইত্যাদি বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আমাদের গ্রামে এমবিবিএস ডাক্তার যেতে চাইত না কারণ সেখানে রাস্তা-ঘাট-বিদ্যুৎ কোন কিছুই নেই। ডাক্তার কখনো কখনো আসত, কিন্তু কিছুদিন পর আবার চলে যেত। আমরা একজন দক্ষ প্যারামেডিকসকে ১২ হাজার টাকা বেতন দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছি। এখন গ্রামের লোকেরা চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিনা মূল্যে পাচ্ছে। রাতে বাড়িতে যেয়ে রোগী দেখলে ১০ টাকা ভিজিট দিতে হয়। এই প্রোগ্রামটা এখন খুব ভালো চলছে। এসবের পাশাপাশি গরীব মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া শুরু হয়েছে। সেখানে ৮০% মেয়ে এবং ২০% ছেলেকে বৃত্তি দেয়া হয়। স্কলারশিপ প্রোগ্রামটা অভিনব এবং নতুন সংযোজন, যা আমাদের গর্ব। এই প্রকল্পে ৪০ হাজার ডলার খরচ হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রকল্পকে স্বনির্ভর করার চিন্তা রয়েছে আমাদের।

গত বছর থেকে আমরা রংপুরের দু'টি গ্রামে কাজ শুরু করেছি ESDO (Environment & Social Development Organization) নামে একটি এনজিও-র সহায়তায়। গ্রাম দু'টির নাম বাথগাড়ি এবং চরণী যা গঙ্গাচড়া থানায় অবস্থিত। অনুন্নত এই দুই গ্রামে ১ বছর ধরে কাজ চলছে। আমি গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সেখানে গিয়েছিলাম। ৪টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ১টি কম্পিউটার কেন্দ্র (যারা এসএসসি পাস তাদের জন্য) এবং ২টি সেলাই কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও ঐ স্কুলগুলো করছে। এই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ২০০ মহিলা, যারা লেখাপড়া জানে না তারাও কাজ শিখছে। অথচ গত ৩০ বছর ধরে এখানে বিভিন্ন সংগঠন কাজ করে চলেছে। কারণ জানতে গিয়ে জানলাম, ৩টি গ্রামে রয়েছে ১টি মাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১১টি মাদ্রাসা। যেহেতু স্কুলগুলো বেশ দুরত্বে অবস্থিত

তাই অধিকাংশ মেয়েই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। সেখানে তাদের বাংলা বা অঙ্ক শেখানো হয় নি। কোরান শরীফ পড়ানো হয়েছে। তারা এখন আমাদের স্কুলে বাংলা মাধ্যমে পড়াশুনা করছে।

আমি অভিভূত হয়েছি চলতি বছর আমার গ্রামে ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উদযাপনের কর্মসূচি দেখে। র‍্যালিতে প্রায় ২০০ ছেলে-মেয়ে অংশ নিয়েছিল। তাদের উৎসাহ এবং শ্লোগান শুনে বিমোহিত হয়েছি। তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মাতব্বরের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজেদের লেখা নাটকও মঞ্চস্থ করেছিল।

আর এক সংগঠন 'আশা'

তহবিল সংগ্রহের লক্ষে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে একটি অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার। কয়েকজন বন্ধু মিলে ১৪ বছর আগে ASHA (Asian women self health association)-নামে আরেকটি সংগঠন তৈরি করেছি। ওয়াশিংটনে অবস্থিত আমার বাড়িতেই এর কার্যক্রম শুরু হয়। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের মেয়েরা যারা স্থানীয়ভাবে নির্যাতিত তাদের সাপোর্ট গ্রুপ হিসেবে আমরা তাদের মানসিক, অর্থনৈতিক এবং আইনগত সহায়তা দিচ্ছি। মূলত অধিকার রক্ষার কাজ। এত বছর ধরে নিষ্ঠার সাথে আমরা এই কাজ করছি। আমার মেয়ে মণিকা বোস একজন আইনজীবী; তিনি এর বোর্ড মেম্বার হিসেবে আইনি দিকগুলো দেখছেন। আমার ছোট মেয়ে অনিতা বোস আমেরিকার একটি বড় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে কর্মরত। সেও বিভিন্নভাবে সংগঠনের কাজে আমাদের সহায়তা করে। কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব কোন স্থানীয় আশ্রয় কেন্দ্র নেই। ওয়াশিংটনে যদি আমরা একটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলতে পারি তাহলে কাজের গতি বাড়বে; কিন্তু সেটি গড়ে তোলার ক্ষমতা আমাদের এই মুহূর্তে নেই। একমাত্র 'মানবী' নামের একটি সংগঠন আছে নিউ জার্সিতে, তারাই আমাদের পথিকৃৎ। তাদের কাছ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছি প্রতিটি শহরে সহায়ক গ্রুপ তৈরির কাজে। শর্মিতা দাসগুপ্ত এর উদ্যোক্তা। এভাবেই আমরা আমেরিকাতে থেকেও দেশের নারী ও শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা করে যাবই।

কিশোরী নির্যাতন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নাছিমা আক্তার জলি*

বর্তমানে কিশোরী নির্যাতন আমাদের সামাজিক, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বিষয়টি এখন এমন এক স্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত হয়েছে যে, এটি আমাদের চোখে ও মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই তৈরি করে না। আমরা এ নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন করি না, প্রতিবাদ করি না, কখনও গভীরভাবে ভাবিও না। সাম্প্রতিককালে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো খুললেই যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, কিশোরী নির্যাতন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কিশোরী নির্যাতনের ধরন বাড়ছে, বাড়ছে এর মাত্রাও। প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি কিশোরীদের মনে এক গভীর নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। ফলে কিশোরীর বাধাহীন মানসিক বিকাশ এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠছে। তার পৃথিবী হয়ে আসছে সঙ্কুচিত। তার প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ক্রমশ দূরবর্তী করে তুলছে 'উন্নয়ন, শান্তি ও সমতা'র অভিষ্ঠ লক্ষ্যকে।

একজন কিশোরীর অস্তিত্ব যদি হুমকীর সম্মুখীন হয়, তার স্বাধীনতা যদি খণ্ডিত হয়, শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ যদি ব্যাহত হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার অমিত সম্ভবনার দ্বারগুলো রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বাধাগ্রস্ত হয় জাতীয় উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন। এজন্যই প্রয়োজন কিশোরী নির্যাতনের কারণ ও ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা। যেনো সমাজে বিদ্যমান প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক ও পারিবারিক কুসংস্কারচ্ছন্নতা, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার ফলে উদ্ভুত ঘৃণ্যতম কার্যক্রমগুলোর অবসান ঘটে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং নতুন নতুন কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, কিশোরী নির্যাতনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালে প্রকাশিত দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান তৃতীয়। অনেকের ধারণা, বর্তমানে এ বিষয়ে জরিপ পরিচালনা করা হলে, বিশ্বে নারী নির্যাতনে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করবে বাংলাদেশ।

একটি দেশের সাধারণ মানুষের অসচেতনতা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা সর্বোপরি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অসচ্ছতা, দায়িত্বহীনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে বাংলাদেশের কিশোরী নির্যাতনসহ নারী নির্যাতনের মাত্রা ও ধরন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বিশেষত, কিশোরী মেয়েদের পথে

* প্রোগ্রাম ম্যানেজার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সম্পাদক, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

ঘাটে উত্ত্যক্ত করা, বিভিন্ন ধরনের কু-প্রস্তাব দেয়া, এসকল প্রস্তাবে রাজি না হলে এসিড নিক্ষেপ করা, ধর্ষণ করা, ধর্ষণের পর হত্যা করা ইত্যাদি ভয়বহ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিসংঘের তথ্য মতে, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ওপর তার পুরুষ সঙ্গীর শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। বিবাহিতা নারীদের শতকরা ৬০ ভাগ স্বামীর হাতে মার খায়। ইউনিসেফ-এর তথ্য মোতাবেক, ১৮ বছর বয়সের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ কিশোরী বিবাহিতা। অল্প বয়সে বিয়ে, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা, জড়তা ইত্যাদি কারণে প্রতিনিয়তই তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ফলে কিশোরী বধূর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন হয়ে উঠে সংঘাতময় এবং সঙ্কটাপন্ন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিশোরী নির্যাতন শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবার থেকে যেসকল নির্যাতন করা হয় সেগুলোকে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে মনে করা হয়। এছাড়া তারা সামাজিক নির্যাতন এবং কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রীয়ভাবেও তারা নির্যাতনের শিকার হয়। সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বেরিয়ে এসেছে যে, আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ কিশোরী যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবারের নিকটতম আত্মীয়ের দ্বারা সংঘটিত হয়। এসকল ক্ষেত্রে নির্যাতকরা সম্পূর্ণরূপে নাগালের বাইরে থাকে। কেননা কিশোরীরা লোকচক্ষুর ভয় এবং নালিশ করলে উল্টো অপবাদের ভয়ে মুখ খোলে না। অনেক সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বিষয়গুলো বিশ্বাস করতে চায় না। এরূপ অবস্থায় কিশোরীর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হয়, যা তাদের পরবর্তী জীবনকে বাধাগ্রস্ত করে।

কিশোরী নির্যাতনের কারণ ও ধরন

কিশোরী নির্যাতনের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম কারণগুলো হলো– সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতি, রেডিও-টিভিসহ গণমাধ্যমের কিছু বিভ্রান্তি মূলক তথ্য, পুরুষের বেকারত্ব, কিশোরীর বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, পুরুষের 'পৌরুষ' বা ক্ষমতার প্রভাব খাটাবার এক অপপ্রয়াস ইত্যাদি।

- **পারিবারিক নির্যাতন:** শিশুর জন্য সবচাইতে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হলো পরিবার। অথচ এই পরিবারই অনেক ক্ষেত্রে কিশোরীর নির্যাতনের প্রথম সোপান হয়ে দাঁড়ায়। কিশোরীর প্রয়োজনের তুলনায় পুষ্টি কম দেয়া হয়। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, স্বাস্থ্য এমনকি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও যথাযথ যত্ন নেওয়া হয় না। পরিবারের নিকট আত্মীয়দের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়। যা তারা প্রকাশ করে না বা করতে পারে না। এসকল সংঘটিত সহিংসতামূলক ঘটনাগুলো অনেক সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়।
- **দৈহিক নির্যাতন:** বয়ঃসন্ধিকালে স্বভাবজাতভাবেই কিশোরীরা চঞ্চল হয়ে উঠে। নিজেদের বোঝার অস্পষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে এমন কিছু কাজ করে যা তার ব্যক্তিগত জীবন এবং পারিবারিক জীবনকে বিড়ম্বনার বেড়াজালে আবদ্ধ করে। সামাজিকভাবেও এজন্য মাশুল দিতে হয়। কিশোরীকে গৃহে বা বাইরে দৈহিকভাবে আঘাত বা মারধর করা হয়।
- **মানসিক নির্যাতন:** পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে প্রায়ই কিশোরীর উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। অধিকাংশ সময়ই কিশোরীকে যেহেতু একজন মানুষ হিসেবে মনে করা হয় না, তাই তার মন বা স্বত্ত্বাকেও স্বীকার করা হয় না। পরিবারে তার মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ থাকে না। যদি ক্ষেত্র বিশেষে কোনো কিশোরী হঠাৎ কোনো মতামত প্রকাশও করে তাহলে তাকে 'ইঁচরে পাকা' বলে অভিযুক্ত করা হয়। পরিবারের সুনাম-খ্যাতি নষ্ট হবে এই অজুহাত প্রদর্শন করে অনেক সময়ই কিশোরীর স্বাভাবিক চলাফেরাকে প্রতিরোধ করা হয়। গৃহ নামক জেলখানায় বন্দী করে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। একজন কিশোরের ন্যায় খোলা মাঠে কিশোরী কখনই খেলতে পারে না। ইচ্ছে হলেই সে গাছের ডালে উঠতে পারে না, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারে না। কারণ তার প্রতি আঙ্গুল উঁচিয়ে বলা হয় – গেছো মেয়ে, নষ্টা মেয়ে, পথভ্রষ্টা। ফলে কিশোরীর শারীরিক, মানসিক বিকাশসহ বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশও ব্যাহত হয়।
- **যৌন নির্যাতন:** ধর্ষণ, গণধর্ষণ ঘরে বাইরে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানী।
- **কু-প্রস্তাব বা উত্ত্যক্তকরণের মাধ্যমে নির্যাতন:** পথে ঘাটে বখাটে ছেলে, কখনো কখনো বয়স্ক পুরুষ কর্তৃকও বিভিন্ন ধরনের কু-প্রস্তাব প্রদান ও উত্ত্যক্ত করার মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়। কু-প্রস্তাবে রাজি না হলেই কিশোরীর জীবন হুমকীর সম্মখীন হয়ে পড়ে।
- **প্রজনন অধিকারহরণ সংক্রান্ত নির্যাতন:** কিশোরী বয়সে বিয়ে, গর্ভধারণ, গর্ভপাত এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহারে বাধ্য করানো। ইউনিসেফ-এর তথ্য মোতাবেক, ১০-১৪ বছর বয়সী বিবাহিত কিশোরীর শতকরা ১৫.৬ ভাগ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণ করে।

- **প্রচলিত রীতি-নীতি বা কুপ্রথাভিত্তিক নির্যাতনঃ** যৌতুক সংক্রান্ত নির্যাতন, পারিবারিকভাবে পুত্রশিশুর তুলনায় কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা। একতরফা বিচার করে কিশোরীসহ তার পরিবারকে এক ঘরে করা, দোররা মারা, রাস্তায় কু-প্রস্তাব বা উত্ত্যক্তকরণের পেছনেও কিশোরীকে দায়ী করে পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে কিশোরীকে হত্যা করা বা আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দেয়া।
- **কিশোরীকে পণ্যে পরিণত করে নির্যাতনঃ** দেহ ব্যবসা, পাচার, উটের জঁকি, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে নারী দেহের যৌন আবেদনমূলক ব্যবহার, পর্ণোগ্রাফি বা নীল ছবি তৈরি ইত্যাদি।
- **যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকালীন সময়ে কিশোরী নির্যাতনঃ** যুদ্ধ ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নানাভাবে কিশোরীরা নির্যাতনের শিকার হয়। যুদ্ধ, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হামলার সময়েও একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে, কিশোরীরা সবসময়েই নির্যাতনের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কিশোরী নির্যাতনের খেসারত বা মাশুল

কিশোরী নির্যাতনের ফলে কেবল মাত্র কিশোরীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, এর মাশুল গোটা পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই প্রদান করতে হচ্ছে। কিশোরী নির্যাতনের ফলে পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে পারস্পারিক অবিশ্বাস ও অনাস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে পড়ছে। ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও তারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছে না। রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি। এক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে আছে।

ইউনিনেফ-এর তথ্য মোতাবেক, কন্যাশিশুর খাদ্য ও পুষ্টির প্রতি অবহেলার কারণে কিশোরদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হারে কিশোরীরা যে সকল রোগে ভুগছে তা হলো– বাতজ্বর, সাধারণ জ্বর, আমাশয় এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। ১৩-১৭ বছর বয়সী কিশোরীদের অর্ধেকের বেশি স্বাভাবিকের তুলনায় কৃশ। পরবর্তীতে এরাই ভিটামিন 'এ' ঘাটতির কারণে অধিক সময় অসুস্থ থাকে, গর্ভাবস্থায় মৃত্যু ঘটে এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, আমাদের দেশে ২০ বছর বয়সী বা তার উর্ধ্বে নারীদের তুলনায় ১৮ বছর বয়সের কম প্রসূতিদের মৃত্যুর সম্ভবনা প্রায় ২-৫ গুণ বেশি।

কিশোরী নির্যাতনের হার ঘরে-বাইরে, সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের হারাতে হচ্ছে রিমি, সীমি, মিমি, মহিমা, কিশোরী বধূ জেনিদেরকে। এসিড সন্ত্রাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর ফলে আমাদের অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সামাজিক এবং পারিবারিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা হেয় প্রতিপন্ন হওয়ায় নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। ফলে নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করে অনেক কিশোরীর পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কেউ কেউ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে।

কিশোরী তথা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে জাতীয় ও সামাজিক উদ্যোগসমূহ

কিশোরী তথা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু জাতীয় উদ্যোগ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, এসিড নিক্ষেপ আইন ২০০২, মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৭৪। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও কিশোরী নির্যাতন ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীলতার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য বিষয়েও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আমাদের করণীয়

আমাদের দেশে ব্যাপক হারে কিশোরী নির্যাতন সংঘটিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিকে কোনো সমস্যাই মনে করা হয় না। বিশেষ করে গৃহাভ্যন্তরে সংঘটিত শারীরিক নির্যাতনকে একটি সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখা হয়। মানসিক নির্যাতনের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। অথচ এই নানামুখী নির্যাতনের শিকার হয়ে কিশোরীরা হারাচ্ছে তাদের আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীলতা এবং গতিময়তা। তাদের সামনে যে অফুরন্ত সম্ভবনার আলো রয়েছে তা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। এখনই সময়। কিশোরী নির্যাতনকে প্রতিহত করে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের গণজাগরণ সৃষ্টি করা। এ জাগরণের লক্ষ্য হলো সকল প্রকার নির্যাতনের অবসান করে ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করা।

গৃহকর্মী পিংকিদের উত্তরণ

নীলুফার বেগম*

আট/নয় বছরের পিংকি ছোট হাতে তরকারি কুটছে বড়দের মত করে। কখনো বা মশলা পিষছে, হাঁড়ি-বাসন মাজছে, ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে, ঘর মুছছে, কাপড় কাচছে। ছোট্ট খুকুকে সুচু করাচ্ছে, কাপড় পরাচ্ছে, কোলে নিচ্ছে। আবার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হুকুম শোনার জন্য দৌড়াচ্ছে- এর মধ্যে একটু হের-ফের হলে ছোট চুলের মুঠি না হয় কান বা ঘাড় ধরে কম-বেশি মার-ধোর তো দিনে কয়েকবার আছেই।

নবীন গৃহিণী সুশ্রী, উচ্চ শিক্ষিত, দুই কন্যাশিশুর মা। একশত টাকা বেতনের ছোট গৃহকর্মী পিংকির রুজিকে অতি মাত্রায় হালাল করে নিচ্ছেন। সঙ্গে সাথে তৃপ্ত মনে করছেন এই ভেবে যে, তার কথার হের-ফের ধরতে গেলে পরিবারে কেউ করে না। তার শাসনে সবাই কম-বেশি তটস্থ। বয়স্ক কাজের লোক রাখেন না, বেশি বেতন দিতে হয় তদোপরি বেয়াদবিও বেশি খাটানো যায় না। ছোট গৃহকর্মী দিয়ে বড়দের কাজ করিয়ে নিতে পারছেন ভেবে গরবিনী আত্মতৃপ্ত।

পিংকির বয়সী বা কিছুটা ছোটবড় পাশের ফ্লাটের মেয়েরা যখন বাড়িতে হৈ-চৈ, নাচানাচি, আনন্দ-উল্লাস করে কিংবা একত্রিত হয়ে টিভিতে কার্টুন দেখে তখন পিংকি প্রাণান্তকর অতি পরিশ্রমে গলদঘর্ম। তবে কখনো কখনো ছোট্ট খুকুকে কোলে নিয়ে টিভি দেখার সুযোগ পায়, তবে এক নাগারে নয়। ছোট্ট খুকু কাঁদলে তাকে নিয়ে হাঁটতে হয়। হিসু করলে ভেজা কাপড় বদলাতে হয়, হাগু করলে সাফ করতে হয়-আরও টুক-টাক কাজের অন্ত নেই, সেজন্য মিনা কার্টুন পিংকির খুবই পছন্দের হলেও তা এক নাগারে দেখার সুযোগ হয় না।

পিংকির আসল নাম মাসুমা খাতুন। অবস্থাপন্ন বাড়িতে কাজে আসার পর তার নতুন নামকরণ হয়েছে পিংকি। ঐ নামে ডাকলে সেও সাড়া দেয়। এই নামে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এই বয়সে পিংকির চোখের নীচে কালি ও পাঁজরের হাড় গোনা যায়। পিংকির বাড়ি গ্রামে। বাবা-মা গ্রামেই থাকে। বাবা তেমন কিছু করে না। তবে তিনবার বিয়ে করেছে। তিন ঘরেই ছেলে-মেয়ে আছে। তিন বউ এর মধ্যে মেজো বউ সঙ্গে থাকে। যার বুদ্ধির জন্য স্বামী একটু তোয়াজ করেই চলে। তিন ঘরের দশ ছেলে-মেয়ের মধ্যে তার দখলে আছে আটজন। আটজনই অল্প-বিস্তর রোজগার করে। সবাই ঢাকায় বাসা-বাড়ির গৃহকর্মী। মাসে কেউ একশত, কেউ দুইশত-এমন করে সর্বোচ্চ মাসে পাঁচশত টাকা রোজগার করে। বাপ দু-একমাস পরপর এসব টাকা সংগ্রহ করতে ঢাকায় আসে। আসার পর কোন কোন ছেলে-মেয়ের মালিক পুরানো শাড়ী/লুঙ্গি/জামা/কাপড় বা রোজা/রমজান উপলক্ষে নতুন শাড়ী-লুঙ্গিও দিয়ে থাকেন। প্রথম সন্তানের বয়স সম্ভবত ১৫/১৬ আর ছোটটির ৮/৯। এই ছেলে-মেয়েরা আত্মীয় স্বজনদের বিয়ে বা অন্য কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কালে-ভদ্রে বাড়ি যায়। মেজো বউয়ের সন্তান তিনটি তখন মায়ের আদর বা সোহাগটুকু পায়। বড় ও ছোট বউ কোলের সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকে। সেখানেই অবস্থাপন্ন আশ-পাশের বাড়িতে কাজ-কর্ম করে কোন রকমে দিন চলে। শহরে থাকা তাদের সন্তানরা বাপের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নানাবাড়ী এসে কখনো কখনো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাত হয়। চোখের পানি বিনিময় হয়। সন্তানরা মাকে তেমন কিছু দিতে পারে না, তবে মালিকদের বাড়িতে আগত দরদী মেহমানদের দেয়া বকশীশের যৎসামান্য টাকা বাপের শ্যান দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে অভাবী মায়ের ও ছোট ভাই-বোনদের দেয়, এমনটি মেয়েরাই করে ছেলেরা নয়। সন্তানদের কাছে রাখার ক্ষমতা নেই মায়ের, তবে দেশে আসা ভাল কাপড় চোপড় পরা সন্তানদের দেখে মায়েরা একটু খুশি হন এই ভেবে যে, সন্তানরা শহরে ভালই আছে। অভাবের দুনিয়ায় শহরের বাড়িতে নিজেদের নিপীড়নের কথা তখন তারা মায়েদের বলতে চায় না, ভাবে খেতে পরতে পারি এইটুকু কে বা কারা দেবে?

পিংকি যে বাসায় কাজ করে সেখানে আমার যাতায়াত আছে। আমি একদিন দেখলাম মালিকের পাঁচ বছরের মেয়ে বই-খাতা নিয়ে মাস্টারের কাছে পড়ছে, আর শিশু কোলে একটু দূর থেকে পিংকি গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে ও পড়া গিলছে। আমি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একসময় কাজ করেছি। এসকল শ্রমজীবী শিশু বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, সেই প্রেক্ষিতে পিংকির মালিক শিক্ষিত মহিলাকে বললাম- শোনেন, মালদ্বীপ দেশের কথা তো শুনেছেন। সেই দেশের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত সার্ক শিশু সম্মেলনে গিয়েছিলাম-সেই অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলি, তিনি শোনার খুব আগ্রহ দেখালেন। বললাম, সেই দেশের একশত ভাগ নারী ও আটানব্বই ভাগ পুরুষ শিক্ষিত (৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী)। পুরুষদের শিক্ষার হার মেয়েদের তুলনায় কম, কারণ তাদেরকে জীবনের বেশির ভাগ সময় মাছ ধরার কাজে সমুদ্রে থাকতে হয়। তাই তাদের পড়ায় ঘাটতি। সেই দেশে নিজেদের ছেলে-মেয়েরা যে স্কুলে পড়ে, তাদের বাড়ীর কাজের ছেলে-মেয়েরাও সেই স্কুলে পড়ে। কারণ, লেখাপড়া অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

---

* সাবেক যুগ্ম সচিব

এসকল কারণে সেই দেশে শিক্ষিতের হার আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। পিংকির মালিক ভদ্রমহিলাকে বললাম, ওকে শ্রমজীবী শিশুদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিন। এ জাতীয় অনেকগুলো স্কুল ঢাকায় আছে। আপনার বাসা থেকে একটু দূরেও একটি আছে। বিকেলের শিফটে দুই ঘণ্টার জন্য ওকে সেখানে দিয়ে দিন। বই-খাতা সব ফ্রি। 'ও' লেখাপড়া শিখলে আপনার খুকুমণিদের জন্যও ভাল হবে। বাহ্যিকভাবে খুবই সায় দিলেন ও উৎসাহ দেখালেন। আমিও খুব খুশি হলাম। সুযোগ বঞ্চিত পিছিয়ে থাকা শিশুদের স্কুলে ভর্তি করানো, শ্রমজীবী মায়ের শিশু ডে-কেয়ারে রাখা, শহরের ভাসমান নারীদের ভিক্ষার বদলে কাজ-কর্মের খোঁজ খবর দেয়া– এদেরকে নানাভাবে সহায়তা করা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। ভাবলাম পিংকির মালিক ভদ্রমহিলাকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি। পরের দিন পিংকির জন্য খাতা-পেন্সিল ও বই কিনে দিয়ে এলাম। এতে পিংকির মালিকের ছোট্ট পড়ুয়া মেয়ে খুব খুশি। পিংকিও ভীষণ খুশি। তার চোখে-মুখে আনন্দ আর ধরে না। আমি পরিতৃপ্ত মনে সেই বাসা থেকে ফিরে এলাম। কয়েকদিন বিরতির পর আবার তার বাসায় গেলাম। এদিক-ওদিক তাকাই পিংকিকে দেখি না, সবে স্কুলে ভর্তি হওয়া মেয়েটি দৌঁড়ি এসে বলল, পিংকি পড়ে না, পারে না। আপনার কাছে যেনো পিংকী না আসে সেজন্য নিষেধ করা হয়েছে। গৃহকর্ত্রীর ভয়ে ভীতু শঙ্কিত আট/নয় বছরের পিংকির পক্ষে আমার কাছে-ধারে আসা সম্ভব নয়। আমি ফিরে আসার আগে সিঁড়ির গোড়ায় শিশু কোলে পিংকিকে এক ঝলক দেখলাম। আরও শুকিয়েছে। আমাকে দেখে আরও শঙ্কিত। বাড়ির মালিক নবীন মহিলা আমার সাথে অপ্রত্যাশিত ভাল ব্যবহার করলেন। উচ্চ শিক্ষিত নবীন মহিলার কৃত্রিম ব্যবহার ও ছোট্ট অসহায় কাজের মেয়ের প্রতি রূঢ় ও অমানবিক আচরণ আমার মনটা বিষিয়ে তুললো। নিজের সন্তানদের যখন প্রাণভরে আদর করেন, ওদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতের সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেন, তখন ঐ হতভাগী দরিদ্র্য ছোট্ট অসহায় মেয়েটির কথা এতটুকু মনে হয় না? যখন-তখন সামান্য কারণে অযৌক্তিকভাবে শাসন-শোষণ এ কেমন! আমাদের দেশে এই চিত্র একেবারে অপরিচিত নয়। তবে এর ব্যতিক্রম একেবারেই নেই তা বলবো না। কিছু পরিবার আছে যেখানে গৃহকর্মীরা পরিবারের সদস্যদের মতই কম-বেশি থাকে। আবার ছোট্ট গৃহকর্মীদের লেখাপড়ার চেষ্টা করা হয় বা শ্রমজীবী স্কুলে পাঠান হয় খণ্ডকালীন সময়ের জন্য। তবে এসকল বিবেকবান পরিবারের সংখ্যা খুবই কম।

পূর্বে উল্লিখিত দুর্ভাগ্যজনক পরিবেশকে উৎখাত করে ছোট্ট ছোট্ট কাজের শিশুদের জন্য কি করা যায়-এসকল বিষয় আমাদের এবং সরকারকে বিশেষভাবে ভাবতে হবে। এই বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে বিটিভি-তে এক/আধটা প্রচারণা দেখানো হয় কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। ৩০ সেপ্টেম্বর আমাদের দেশে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হতে শুরু করেছে ৭/৮ বছর ধরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে। দিবসটি উপলক্ষে উল্লিখিত বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ করছি।

- গৃহকর্মে নিয়েজিত ছেলে-মেয়েরা এ দেশের পিছিয়ে থাকা দরিদ্র মানুষ, আমাদের গ্রাম-গঞ্জের স্বজন-পরিজনদেরই সন্তান। এদের প্রতি পড়ুয়া সন্তান থেকে বাবা-মা সবারই সহৃদয় ব্যবহার করা কর্তব্য। এদেরকে সাক্ষরজ্ঞান করানো মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ বিষয়ক প্রবন্ধ/নিবন্ধ স্কুলের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এই বিষয়গুলো গেঁথে যাবে। বাবা-মায়ের মনে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।
- একসময় আমাদের দেশে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক বিষয় ছিল গৃহকর্মীকে আক্ষরিক জ্ঞান দান করা। পরবর্তীতে এই পদ্ধতি উঠে যায়। সেই পদ্ধতি আরও প্রত্যক্ষ ফল লাভ বা সুফলের প্রেক্ষিতে সংযোজন, বিয়োজনসহ প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- টিভি চ্যানেলগুলোতে বিষয়ভিত্তিক প্রচারণা ও প্রদর্শন করা যেতে পারে। যার মধ্য দিয়ে গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মনে মানবিকতাবোধ জাগরিত হবে। টিভি চ্যানেলগুলোর কিছু কিছু নাটক সেই বিষয় কেন্দ্রিক হলে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে গৃহকর্মী শিশুদের উপর দায়-দায়িত্ববোধ জন্মাবে।
- গৃহকর্মে নিযুক্ত ছেলে-মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারকে চালু করতে হবে।
- যে সকল গৃহকর্মী ছেলে-মেয়ে লেখা পড়ায় সফলতা দেখাবে- তাদের মালিকদের প্রণোদনামূলক পুরস্কার সরকারের তরফ থেকে প্রবর্তন করা যেতে পারে।
- শহরের রাস্তাঘাটে বের হলে যেনো সকল স্তরের লোকের চোখে পরে এমন স্থানগুলোতেও বিশেষ করে আবাসিক এলাকায় মেগা সাইনবোর্ডে গৃহকর্মী কাজের ছেলে-মেয়েদের নির্যাতন ও নৈতিকতা বিরোধী এরূপ শ্লোগান ও চিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে। কাজের মেয়েকে গৃহকর্তা-গৃহকর্ত্রী কর্তৃক মমতার চোখে দৃষ্টিতে দেখতে হবে, তাদের লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে– এই জাতীয় বক্তব্য ছবি/দৃশ্যসহ তুলে ধরতে হবে, যা দেখে সংশ্লিষ্ট সকলের মনে দায়িত্ববোধ জন্মাবে।
- টেলিভিশন ও রেডিওতে জারী গান, সারি গান, নাটক ও বিভিন্ন ধরনের প্রচারের মাধ্যমে এদেশের নারী পুরুষকে সচেতন করতে হবে- যে, অধিক বিবাহ ত্যাজ্য ও ক্ষতিকর। এক স্ত্রী থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ।
- একবারে ছোট বা অল্পবয়সী সন্তানদের অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে বা মা-বাবার থেকে দূরে পাঠান ঠিক নয়– এই বয়সে বাবা-মায়ের স্নেহ, মমতা ও সান্নিধ্য পাওয়ার অধিকার তাদের আছে। এই পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য স্নেহ-মমতার অধিক প্রয়োজন। নারী ও শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনগুলো গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত শেষ বিষয় দুটির উপর জনসচেতনতা আনতে পারে।
- রিকশার পেছনে বা বাসের গায়ের দুই পাশে গৃহকর্মী শিশুদের নির্যাতন বন্ধের ও তাদের মমতার সাথে এই দেশের স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি স্বল্প কথায় সংবেদনশীল আবেদন থাকতে পারে।

- জেলা প্রশাসন, তথ্য অধিদপ্তর ও মহিলা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পোস্টার, মেগা সাইনবোর্ড, প্রয়োজনে বড় বড় গাছের গায়ে টিন এঁটে গৃহকর্মীদের প্রতি করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো চুম্বুক কথার মধ্য দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে।
- পত্র পত্রিকায় এ বিষয়ে নিবন্ধ লেখা যেতে পারে এবং গ্রহণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলো বিজ্ঞাপন আকারে সরকারের তরফ থেকে শিশু দিবস ও জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে প্রচারিত হতে পারে।
- শিশু একাডেমীর জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের মাধ্যমে অভিভাবক-সন্তানদের নিয়ে মুক্ত আলোচনা সভা হতে পারে।

এইভাবে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রচার-প্রচারণা চালালে দেশে কাজের ছেলে-মেয়েদের কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ ফিরে আসবে। পিংকির মতো ছোট্ট কাজের মেয়ের প্রতি অন্যায় অবিচার আর হবে না এবং তারা মমতাসহ লেখা-পড়ার সুযোগ পাবে অথবা বাবা মায়ের স্নেহতলে থাকবে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত। রোজগারের জন্য অতটুকু মেয়ের প্রতি বাবা-মা আর নির্দয় হবে না। পিংকির মতো মেয়েদের মুখে হাসি থাকবে অনাবিল। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে আমাদের অনেক প্রতিজ্ঞার সাথে একথাও উচ্চারিত হোক যে, ছোট্ট গৃহকর্মী তথা কাজের মেয়েদের আর নিগৃহীত হতে দেব না। তাদেরকেও অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করবো।

কন্যাশিশুদের অধিকার ও মর্যাদা : শহর ও গ্রামীণ সমাজে ব্যাপক বৈষম্য

প্রফেসর নুরুল আলম*

চলতি বছরের ২০০৭ সালের প্রাক্কলিত হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটির কিছু বেশি। জনসংখ্যার বয়স কাঠামো অনুযায়ী দেখা যায় ১৪ বছর পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৩ ভাগ। এর মধ্যে প্রায় ২.৪২ কোটি কন্যাশিশু বা মেয়ে। বর্তমানে গ্রামীণ জনসংখ্যার হার প্রায় ৭৫%। অর্থাৎ এই হিসেবে শূন্য থেকে ১৪ বা ১৫ বছর বয়স কাঠামোর প্রায় ১.৮০ কোটি কন্যাশিশুর বাস গ্রামীণ সমাজে। শহর বা নগরাঞ্চলের কন্যা সন্তানের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। হিসেবটি সরকারি পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত থেকে সংগৃহীত।

বাংলাদেশে মানুষের অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা তথা সব মিলিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ব্যবধান প্রত্যাশিতভাবে কমছে না। নগরায়ণের প্রভাবে শহরাঞ্চলে চিত্রটি কিছুটা ভিন্ন হলেও গ্রামীণ সমাজে পুরুষ ও নারীর আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এখনও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দেশে শূন্য থেকে ১৪ বছর বয়স কাঠামোর প্রায় আড়াই কোটি কন্যাশিশুর সামাজিক অবস্থান বিচার্য। এ প্রসঙ্গে শুরুতেই বলা যায়, প্রায় পৌনে দুই কোটি গ্রামীণ কন্যাশিশু ও শহরাঞ্চলের প্রায় ৬০ লক্ষ কন্যাশিশুর সামাজিক অবস্থানের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। বৈষম্যমূলক এই চিত্রটিই আজকের নিবন্ধনের মূল বিষয়। বৈষম্য শুধু সমাজ ভেদে নয়, শহর ও গ্রামীণ সমাজ নির্বিশেষে অর্থনৈতিক শ্রেণি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই অধিকারহীনতার বৈষম্য বিশেষভাবে বিরাজমান।

বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার বেড়েছে, মানুষের মনোজগতে চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এসেছে। বস্তুতাত্ত্বিক, যুক্তিনির্ভর, সংস্কারহীন আধুনিক চিন্তা ধারার যতটুকু উন্মেষ ঘটেছে তার বেশির ভাগই নগর সমাজের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এ শ্রেণি গোষ্ঠীর মানুষ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন ও হিসেবি। পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে অবহেলা, অমনোযোগ এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় নেতিবাচক মনোভাব এদের মধ্যে দেখা যায় না বললেই চলে। মনের গভীরতম স্থানে পুত্র সন্তানের জন্য একটি অনুচ্চারিত কামনা থাকলেও কন্যাসন্তান জন্মের পর থেকেই এই পরিবারগুলোতে খুব দ্রুত সেটি মেনে নেয়া হয়। পিতা-মাতা পুত্র সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাসন্তানকেও একই পরিচর্যায় সকল প্রকারের সুবিধা সমর্থন দান করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ চিত্রটি সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশে দৃশ্যমান।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে যে প্রতিকূল ঘটনাগুলো আমাদের ব্যথিত করে তা দেশের বিস্তৃত গ্রামীণ সমাজের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল শ্রেণি গোষ্ঠী এবং শহরাঞ্চলের একেবারে নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারগুলোতে প্রকটভাবে বিদ্যমান। আমাদের সমাজে বিগত প্রায় তিন দশক যাবৎ সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং সমাজ কাঠামোর স্বল্পমাত্রার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ইতিবাচক সামাজিক প্রভাব এই নিম্ন আয়ভুক্ত গ্রামীণ জনমানুষের জীবনে খুব বেশি পরিবর্তন আনতে পারে নি। আবহমান কালের প্রাচীন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, দারিদ্র্য, আধুনিক মূল্যবোধ বিমুখতা এবং প্রাথমিক পেশার প্রাধান্য এখনও গ্রামীণ সমাজকে পশ্চাৎপদতার বৃত্তে আবদ্ধ করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, নগর সমাজে অবস্থানরত একেবারে নিম্নবিত্ত ও এক শ্রেণির ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণার অধিকারী জন মানুষের মধ্যেও এ ধরণের পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবোধ বিশেষভাবে উপস্থিত। এ ধরনের পরিবারগুলো নিয়েই এ দেশের বিপুল সংখ্যক কন্যাসন্তানের অধিকার বঞ্চনার চিত্রটি সামনে চলে আসে।

---

* প্রাক্তন চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারগুলোতে দৃষ্টি দিলে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানদের অনাদর, অবহেলা ও অধিকারহীনতার চিত্রটি পাওয়া যায়।

গ্রামীণ সমাজ ও নগরাঞ্চলের নিম্ন আয়ভুক্ত অংশের পরিবারগুলোতে জন্মের সময়েই কন্যা সন্তানকে সাদরে গ্রহণ করা হয় না। উপলব্ধিটি এ রকম, কন্যাসন্তান পরিবারের জন্য সক্ষম উপার্জনকারী সদস্য হবে না, বরং ভবিষ্যতে তাকে পাত্রস্থ করতে হলে অর্থ ব্যয়ের প্রশ্নটি আসবে। পুত্র সন্তানের মত কন্যা সন্তান বংশ রক্ষা করে না। সে অন্য পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। এজন্য কন্যা সন্তানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এমনকি খাদ্য ও বস্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যয় করা অনেকটা অযৌক্তিক মনে করা হয়। অর্থাৎ মূলত নিজ গৃহ থেকেই কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নিম্ন আয়ের পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী কন্যা সন্তানদের একটি বড় অংশ পিতা মাতার অমনোযোগ, উপযুক্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা দানে অনীহা এবং এক ধরণের নিয়তি-নির্ভর ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে পাঁচ বছর বয়সের পূর্বেই মারা যায়। পাঁচ বছরের নিচে প্রতি হাজারে কন্যাশিশু মৃত্যুর হার বর্তমানে প্রায় ৫৮, গ্রামাঞ্চলে ৭০ এর কাছাকাছি।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া অপেক্ষা পরিবারের মর্যাদাহীন কাজে তারা ব্যবহৃত হয়। ন্যূনতম সম্ভ্রম, অধিকার ও নিরাপত্তা নিয়ে তারা অবাধে চলাচল করতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তারা কিছুটা অবহেলা ও বৈষম্যের সম্মুখীন হয়। শিক্ষার জন্য একজন পুত্র সন্তানকে যে সুবিধা ও সমর্থন দেয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাশিশুদের ভাগ্যে তা জোটে না। অবশ্য পরিবারের দারিদ্র্য এর অন্যতম প্রধান কারণ। বয়ঃসন্ধিকালে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মিথ্যা অপবাদ এককভাবে কন্যা সন্তানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। লেখাপড়া নয়, খুব বেশি হলে ধর্মীয় শিক্ষা ও পর্দার নামে অস্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে তাদেরকে আবদ্ধ থাকার ফতোয়া দেয়া হয়। প্রকৃত শিক্ষার আলো ও আধুনিক সমাজের বস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা এভাবে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শহর ও গ্রাম ভেদে একটি নিদিষ্ট বয়সে পুত্র ও কন্যাশিশুরা বিদ্যালয়গামী হওয়ার কথা, সেখানে দেশের দারিদ্র্য পীড়িত ও অশিক্ষায় আচ্ছন্ন বিপুল সংখ্যক পিতামাতা তাদের কন্যা সন্তানদের ঠেলে দেয় নানা ধরণের অমর্যাদাকর ও পারিবারিক কাজে। এর মধ্যে অনেক কন্যাশিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও নিয়োজিত হয়ে পড়ে। অনেককে পারিবারিক স্নেহ মমতার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শহরের সচ্ছল পরিবারে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের কাজে পাঠানো হয়। অনাদর, অবহেলা ও তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কাজের বোঝা তাদেরকে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও অসহায় করে তোলে । আবার কিছুটা সচ্ছল পরিবারের যে সকল কন্যাশিশু স্কুলে যাওয়া শুরু করে সেক্ষেত্রেও পাঠচর্চা ও মেধা বিকাশের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশ ও পর্যাপ্ত পরিচর্যা দেয়া হয় না।

আইন বিরুদ্ধ হলেও অনেক নিরক্ষর ও দরিদ্র পিতামাতা তাদের কন্যা সন্তানদের বাল্যবিবাহে আগ্রহ বোধ করে। পরিণতিতে অল্প বয়সে মাতৃত্ব এবং অনেক ক্ষেত্রে অকাল মৃত্যু ঘটে। এক্ষেত্রে সমাজের ধর্মান্ধতা ও ফতোয়াবাজি বড় ভূমিকা পালন করে। চিত্রটি অবশ্যই গ্রামীণ সমাজে গতানুগতিক ধারায় প্রবাহমান। যদিও কন্যাশিশুদের এই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ক্রমশ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ সমাজে ও শহরের নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে শারীরিক প্রয়োজনের ক্যালরিযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র এবং স্বাস্থ্যসেবা নিতান্তই অপ্রতুল। কিন্তু এর মধ্যেও কন্যাশিশুদের ভাগ্যে এসকল সুবিধা খুব কমই থাকে। ফলে অধিকাংশ কন্যাশিশু অপুষ্টি, অসুখ-বিসুখ ও অবহেলার মধ্য দিয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে যৌবন প্রাপ্ত হয়। এসকল কিছুর মূলে কেবল মাত্র দারিদ্র্যই কারণ তা নয়, এটি অনেকটা রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সৃষ্ট।

এভাবে দেশের জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ শিশু স্তর থেকেই অনাদর অবহেলা, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অধিক বঞ্চিত হয়ে একদিন নারী হয়ে উঠে যারা সমগ্র সমাজের সামগ্রিক কর্মযজ্ঞ, উন্নয়ন ক্ষেত্রে এমনকি নিজ পরিবারের গণ্ডির মধ্যেও সৃষ্টিশীল অবদান রাখতে পারে না।

প্রকৃত অর্থে একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও প্রগতিশীল ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করতে হলে এ সমস্যার সমাধান দরকার। বিষয়টির সামগ্রিক প্রতিকার একেবারে সহজ নয়। নির্দিষ্ট সময় কাঠমোর মধ্যেও তা সম্ভব নয়। কারণ সমাজের যে শ্রেণি গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ বংশ পরম্পরায় এ ধরণের মনোভাব গভীরভাবে গ্রোথিত হয়ে আছে তা অপসারণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, ধারাবাহিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা দরকার। এ প্রসঙ্গে নিচে কয়েকটি সুপারিশ নিবেদন করা হল।

- দেশের সর্বত্র বিশেষ করে উপজেলা ও তার নিচের স্তরে অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কাঠামোর মধ্যে স্থাপন;
- মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে কন্যাশিশুদের বৈষম্যমূলক সামাজিক অবস্থা নিরসন এবং তাদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় সংযোজন;
- গ্রামীণ সমাজে অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার প্রসার;
- গ্রামাঞ্চল ও শহরের বিত্তহীন দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্র্য নিরসনের কার্যকর কর্মকৌশল প্রণয়ন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি খাতে কর্ম সুযোগ বৃদ্ধি করে প্রাথমিক পেশা থেকে অন্যান্য ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব শ্রমশক্তির স্থানান্তর;
- প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা;
- কন্যাশিশুদের স্কুল শিক্ষায় সম্পৃক্ত করা ও তা থেকে ঝড়ে পড়া প্রতিরোধের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক কর্মতৎপরতা গ্রহণ;
- কন্যাশিশুদের জন্য সকল প্রকার নিরাপত্তা বিধানকল্পে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ;
- নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে এ সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দেয়া সমীচীন। নির্বাচনের পূর্বে সমাজের অধিকার বঞ্চিত কন্যাশিশুদের অধিকার সংরক্ষণে তারা জনসমক্ষে অঙ্গীকার করতে পারেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সক্রিয় সহযোগিতা এ সমস্যাটি লাঘবে অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ।

নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত মতামতের প্রেক্ষিতে এ সমস্যা নিরসনে গ্রামাঞ্চলের মধ্য ও নিম্ন আয়ের পরিবার ও শহরের বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এই কর্মতৎপরতার প্রধান "টার্গেট গ্রুপ" হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন হবে। এই বিরাট বৈষম্যমূলক ব্যবস্থায় কেবল নারী গোষ্ঠীর অগ্রগতিই নয়, দেশের সমগ্র আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে বাধাগ্রস্থ হবে। মনে রাখা দরকার, মানুষে মানুষে বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে মর্যাদা ও অধিকারের ব্যবধান কমাতে না পারলে সমাজের কেউই স্বস্তি কর ও নিরাপদ জীবন আশা করতে পারে না।

আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে

পলাশ চৌধুরী*

কেবল কন্যাশিশু হওয়ার অপরাধে শিশু বাবলীকে জন্মের পরপরই এসিড খাইয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বাবলীর পিতা। আমরা বলি, অন্ধকার কেটে গেছে। নতুন শতকের দুনিয়ায় জীবনযাপন করছি। কিন্তু বাবলীর ঘটনা তো এই সেদিনের। অন্ধকার থেকে আলোর মতো ফুটে উঠছে বাবলী, সে এখন স্কুলে যায়। আধো আধো করে ছড়া বলে : কে মেরেছে? কে মেরেছে? বাবা মেরেছে, বাবার হাতে এসিড ছিল ছুঁড়ে মেরেছে কাকে মেরেছে? কাকে মেরেছে ? মেয়েকে মেরেছে, মেয়ে হওয়ার অপরাধে এসিড মেরেছে। এসিড সহিংসতা থেকে রক্ষা পাচ্ছে না শিশুরাও। বিশেষ করে, কন্যাশিশুর ওপর নির্যাতনের চিত্র নতুন কিছু নয়। ২০০২ সালে যখন এসিড সহিংসতার মাত্রা বেড়ে এ যাবতকালের সর্বোচ্চ হয়েছিল; সে সময় শিশুদের ওপর এসিড সহিংসতা কম থাকলেও ক্রমেই বেড়ে চলে। ২০০৫ সালে প্রায় ৩২ জন কন্যাশিশু (১৮ বছরের নীচে) এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়। আজকের যে কন্যাশিশু আগামী দিনে তিনিই নারী। কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা নারী নির্যাতনেরই প্রাক-রূপ। অতি সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার গোপীনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সাকিনা আক্তার এসিড নিক্ষেপ এবং অপহরণের হুমকির কারণে প্রায় দেড় মাস স্কুলে যেতে পারে নি। পরিবারের অন্যান্যের ওপর ঈর্ষা-প্রতিশোধ পরায়ণতার শিকার হচ্ছে শিশুরাও। বাবার কোলে থেকেও চার বছরের কন্যাশিশু বরিশালের তাসলিমা রেহাই পায় নি এসিড সহিংসতার হাত থেকে।

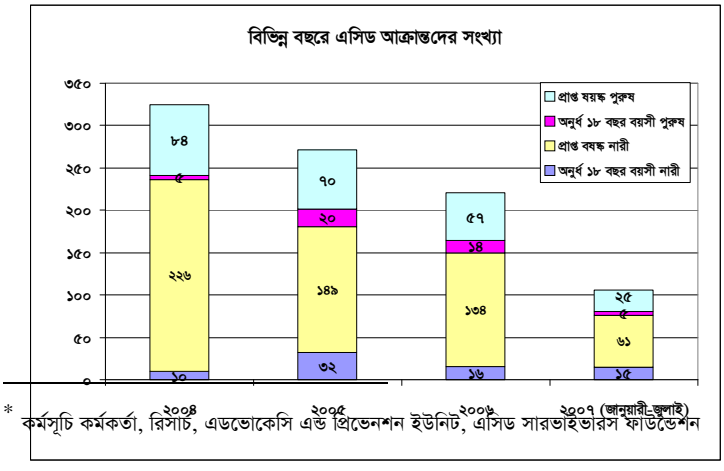

* কর্মসূচি কর্মকর্তা, রিসার্চ, এডভোকেসি এন্ড প্রিভেনশন ইউনিট, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

সবার নীচে, সবার পিছে সর্বহারাদের মাঝে সেই নারীরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হয়ে চলেছেন! আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচি-জনমত গঠনের ফলে কিছুটা পরিবর্তন হলেও এখনো নারীর প্রতি সহিংসতা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হ্রাস পেয়েছে বলা যাবে না। তবে, এই উন্নয়ন প্রচেষ্টায়, জনমত গঠনে বিভিন্ন সংস্থার সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে এসিড সহিংসতা কিছুটা

হলেও কমছে বলে মনে করি। এই প্রচার-প্রচারণা ব্যাপকভাবে চালিয়ে যেতে হবে। বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে আরো বেশি করে। কারণ প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ।

আদর্শ পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'না' বলবেন

আমরা মনে করি, বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন পুরুষেরা। দেখা গেছে, নারী-শিশু নির্যাতনের অধিকাংশই ঘটছে পুরুষদের দ্বারা। এখানে মনে রাখতে হবে সকল পুরুষই নারী নির্যাতন করেন না। কিছু সংখ্যক পুরুষ যারা নারী নির্যাতন করেন বা করেছেন তাদের কেউ বাধা দেন নি কখনো। আমরা খুঁজছি সেইসব আদর্শ পুরুষদের যারা এসিড সহিংসতা সহ সকল ধরনের নারী-শিশু ও পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'না' বলবেন। আমরা জানি, প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও মহল্লায় এমন আদর্শ পুরুষ রয়েছেন। হয়তো তাদের সবাইকে আমরা চিনি না। তাদের এগিয়ে আসাটা আজ খুব জরুরি।

এতক্ষণ আমরা যে পুরুষের কথা বললাম তারা শুধু শারীরিকভাবে যে পুরুষ তারাই নন। যে নারী শারীরিকভাবে নারী কিন্তু পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ তিনিও এই তালিকায় পড়বেন। অর্থাৎ আমাদের অবস্থান পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। অনেকেই জানেন, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন এসিড সহিংসতার বিরুদ্ধে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পুরুষদের সমাবেশ ও র‍্যালি আয়োজন করে থাকে। দেশের শীর্ষ পুরুষেরা এসে এই সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করেন। এই আয়োজন দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে।

এসিড সহিংসতার বর্তমান চিত্র

এসিড সহিংসতায় এই বছর (২০০৭) জুলাই মাস পর্যন্ত ১৫ জন অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী কন্যাশিশু আক্রান্ত হয়েছেন। একই সময়ে ছেলে শিশু আক্রান্ত হয়েছেন ৫ জন। পরিসংখ্যানে প্রায় তিনগুণ কন্যাশিশু এসিড সহিংসতার শিকার হওয়ার বিষয়টি আমাদের সতর্ক ইঙ্গিত বহন করে। পরবর্তীতে নারীদের ওপর এসিড নিক্ষেপের হারও প্রায় তদ্রুপ। একই সময়ে নারী আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ জন এবং পুরুষ আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ জন। আমরা চাই, নারী-পুরুষ যে-ই হোক আর একটি মুখও যেন এসিডে ঝলসে না যায় । কিন্তু এসিড নিক্ষেপের ধরণ-প্রকৃতি দেখে বোঝা যায়, নারীর ওপরই যত রোষ। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, এসিড নিক্ষেপের অন্যতম কারণ জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ; বাংলাদেশে কতটুকু জমির মালিক নারী? উত্তর সবারই জানা। তবুও জমি সংক্রান্ত বিরোধে, পারিবারিক দ্বন্দ্বে, অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখানে নারীকেই গুণতে হচ্ছে মাশুল; ক্ষত নিয়ে, জীবন দিয়ে।

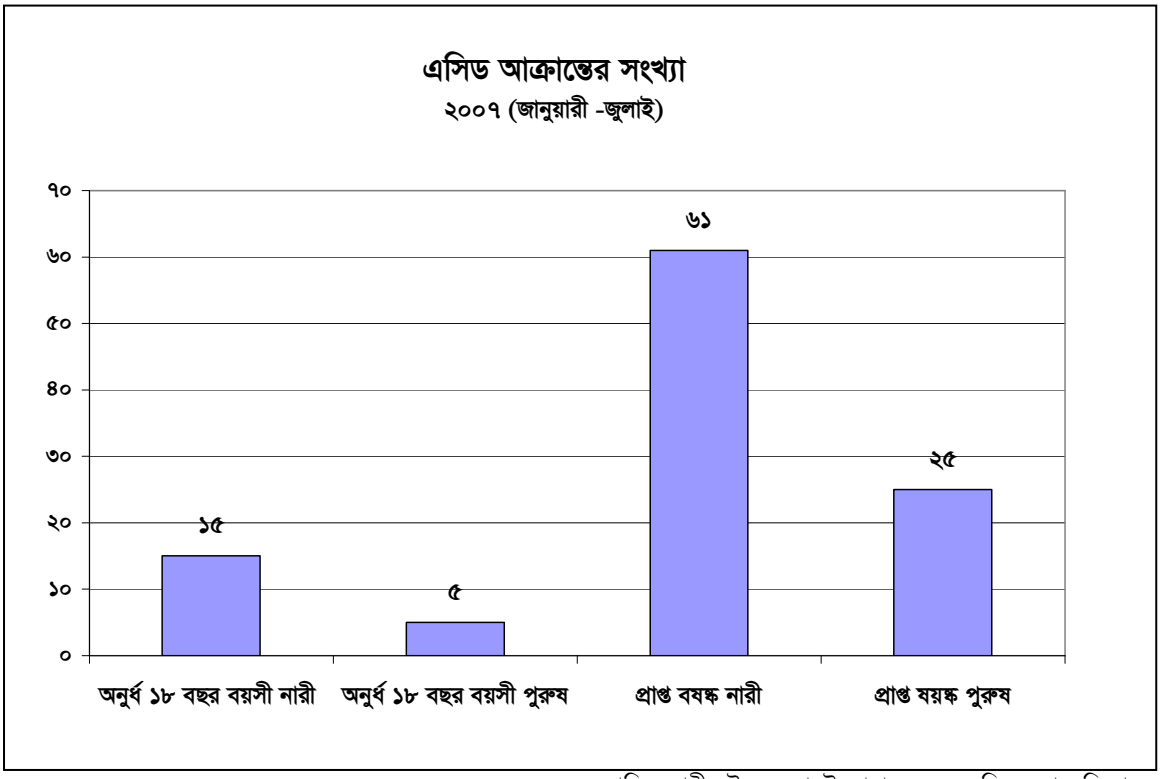

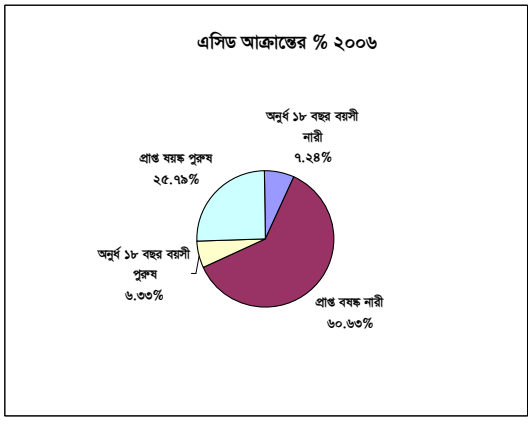

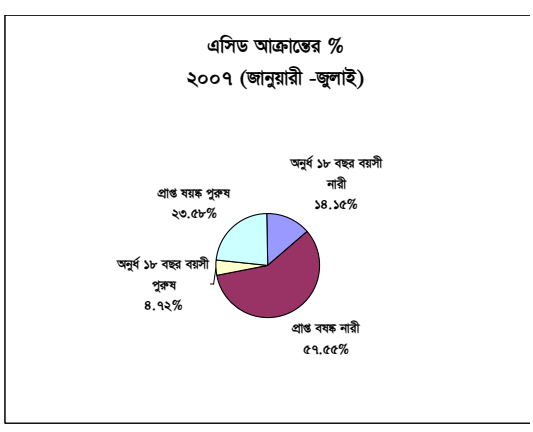

এসিড সহিংসতায় আক্রান্তরা যখন 'সারভাইভার'

এসিড 'ভিকটিম' আর 'সারভাইভার'-দু'টি শব্দ আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি। যিনি জীবনের সকল যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে, সমাজের তথাকথিত উৎসুক দৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে, নিজ যোগ্যতায় সমাজের মূলধারায় আমাদের সঙ্গে একই ছন্দে কাজ করে চলেছেন সারভাইভার তিনিই। একজন সারভাইভার মনে করেন, জীবনের সকল কিছু শেষ হয়ে যায় নি, জীবনের মানেটা সবার জন্য একই হতে হবে তাও নয়। নিজের জীবন নিজেকেই সাজাতে হবে। আমরা গত বছর এসিড সারভাইভারদের জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করেছিলাম। প্রায় একশ' সারভাইভার এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে তারা প্রাণ খুলে গেয়েছিলেন গান, নেচেছিলেন আর বলেছিলেন অনেক না বলা কথা। একজন সারভাইভার বলেছিলেন, এখানে এসে নিজেকে একবারও মনে হয় নি আমি এসিড আক্রান্ত, আমি সৌন্দর্যহীন। আমরা এমনি সময়ের সন্ধানে আছি, যখন সারভাইভারদের মনের সৌন্দর্য দেখার মতো চোখ আমাদের তৈরি হবে।

প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

এসিড সহিংসতায় আক্রান্তের পরিমাণ গত বছরগুলোর তুলনায় কমছে। কিন্তু আমাদের আত্মতৃপ্তির কোন সুযোগ নেই। আজ শুধু নারী-পুরুষই নয় আমাদের শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। যতক্ষণ আমাদের সমাজে ন্যূনতম একটি এসিড সহিংসতার ঘটনা ঘটবে ততক্ষণ চলবে আমাদের প্রাণপণ লড়াই। আমাদের সন্ত ানদের বাচাঁতে হবে, এটি কারো একার কাজ নয়, এটি হতে হবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

জীবনচক্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের পরিণতি

ড. বদিউল আলম মজুমদার*

নারী-পুরুষের বৈষম্য সর্বব্যাপী। এ বৈষম্য মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে শুরু হয়েছে। যুগ যুগ ধরে এটি চলমান। সকল সমাজেই এটি বিদ্যমান, যদিও এর ব্যাপকতার ভিন্নতা রয়েছে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে এটি দৃশ্যমান। জন্মের পূর্ব থেকে আমৃত্যু – জীবনের প্রতিটি স্তরে বা পুরো জীবনচক্রে – এটি বিরাজমান।

ভ্রূণ ও নবজাতক হত্যা

নারী-পুরুষের বৈষম্যের সূচনা হয় জন্মের আগ থেকেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমানে গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ চিহ্নিত করা সম্ভব। অনেক সমাজে আর্থ-সামাজিক কারণে ছেলে শিশুর প্রতি অধিক আকর্ষণের ফলে এ প্রযুক্তি ভ্রূণ হত্যার সহায়ক হিসেবে কাজ করে। যদিও এ অপব্যবহারের প্রমাণ চূড়ান্ত নয়, তবুও জন্ম ও জনমিতির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, এশিয়া মহাদেশে, বিশেষত চীন ও ভারতে পাঁচ বছরের কম বয়সী মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা বেশি। ভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে এ সকল দেশের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার সত্ত্বেও এ নির্মম গণহত্যা ক্রমাগতভাবে চলছে। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশে এ সমস্যা প্রকট নয়।

বাল্যকাল

বাল্যকালের প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া এবং শিশুরা যেনো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে তা নিশ্চিত করা। তবে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, কন্যাশিশুরা সাধারণত শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার।

প্রাথমিক শিক্ষা: বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের তুলনায় কন্যাশিশুর ঝরে পড়ার হার ১৫ শতাংশ বেশি। যদিও এক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমাগতভাবে কমছে, তবুও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া উন্নয়নশীল দেশের প্রতি পাঁচটি কন্যাশিশুর মধ্যে একটি ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ার কারণে এ সকল কন্যাশিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ ব্যাহত হয় এবং তাদের পরবর্তী জীবন অনেকক্ষেত্রে সমস্যা সঙ্কুল হয়ে পড়ে। গবেষণা থেকে দেখা যায়, শিক্ষিত নারীদের প্রসবকালীন মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম এবং তাদের সন্তানরা অধিক হারে বিদ্যালয়গামী হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরো দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী মায়ের পাঁচ বছরের কম বয়সী সন্তানদের তুলনামূলক মৃত্যুর হার প্রায় অর্ধেক। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভর্তি ও ঝরে পড়ার হারে অনেকটা সমতা বিরাজ করলেও, উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে অনেক মেয়ের নাম শুধু নামকাওয়াস্তে স্কুলের খাতায় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়: ইউনিসেফ-এর তথ্যানুযায়ী, সারা পৃথিবীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যাওয়ার মত বয়সী কন্যাশিশুদের মাত্র ৪৩ শতাংশ স্কুলে যায় এবং এদের অনেকে ঝরে পড়ে। বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার ছেলেদের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। মেয়েদের স্কুলে না যাওয়ার অনেকগুলো কারণ

* গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং সভাপতি জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

রয়েছে। অনেক সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই অভাব বিরাজমান – সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অপেক্ষাকৃত জোর দেয়ার ফলে অনেক দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় নি। বাল্যবিবাহ এর আরেকটি বড় কারণ। শিক্ষার ব্যয় বহনে অভিভাবকদের অক্ষমতাও আরেকটি কারণ।

মাধ্যমিক শিক্ষার সুফল অনেক। এর মাধ্যমেই প্রথম গর্ভধারণ বিলম্বিত, মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষিত এবং কিশোরীদের চলাফেরার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যায়। একই সাথে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পরিবার ও সমাজে তাদের অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

বয়ঃসন্ধিক্ষণ

বয়ঃসন্ধিক্ষণে কন্যাশিশুর জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো নির্যাতন, এক্সপ্লয়টেশন বা ব্যবহৃত হওয়া ও সহিংসতা। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব কিশোরীদের জন্য আরেকটি বড় ঝুঁকি।

নারীর যৌনাঙ্গের বিকৃতি: অনেক সময় সামাজিক ও চিকিৎসার-জন্য-নয় এমন কারণে নারীর যৌনাঙ্গ আংশিক বা পুরোপুরিভাবে কেটে ফেলা বা বিকৃত করা হয়। এ ধরনের ভয়াবহ সংস্কার আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৩ কোটি বর্তমানে-জীবিত-আছেন এমন নারী এ ধরনের সহিংসতার শিকার। এ ধরনের সহিংসতা নারীদের স্বাস্থ্য, এমনকি জীবনের জন্য ভয়াবহ ঝুঁকির সৃষ্টি করে। সৌভাগ্যবশত এ ধরনের সমস্যা আমাদের দেশে অনুপস্থিত।

বাল্য বিবাহ ও অপ্রাপ্ত বয়সে সন্তান ধারণ: বিশ্বব্যাপী ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স্ক বিবাহিত নারীদের ৩৪ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার। ১৮ বছরের কম বয়সী এসকল নারীদের অধিকাংশ দক্ষিণ এশিয়া ও সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিবাসী। বাল্যবিবাহের সমস্যা বাংলাদেশে প্রকট। ইউনিসেফ-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগই বিবাহিত। বাল্যবিবাহের অনেক জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে, দারিদ্র্য ও যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকি যার অন্যতম।

বাল্যবিবাহের পরিণতি অপ্রাপ্তবয়স্ক মাতৃত্ব। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর ১৫-১৯ বছর বয়স্কদের মধ্যে আনুমানিক এক কোটি ৪০ লক্ষ কিশোরী সন্তান প্রসব করে। বিশ্বের কোটার নারীদের তুলনায় ১৫ বছরের কম বয়সী কিশোরীদের গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবকালীন মৃত্যুর হার পাঁচগুণ বেশি। ১৯ বছর বয়সোর্ধ্ব মায়েদের তুলনায় ১৮ বছর বয়সের নিচের মায়েদের সন্তানের জন্মের প্রথম বছরে মৃত্যুর হার ৬০ শতাংশ বেশি। এ ধরনের মায়েদের শিশুরা বেঁচে থাকলেও, তারা স্বল্প ওজন ও অপুষ্টিতে ভোগে এবং পরবর্তী জীবনে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

যৌন হয়রানি ও পাচার: অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোরীরা সাধারণত বাধ্য বা ব্যবহৃত হয়ে যৌন কাজে লিপ্ত হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী, ২০০২ সালে ১৮ বছরের কম বয়সের কিশোরীদের মধ্যে ১৫ কোটি এবং ছেলেদের মধ্যে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ বল প্রয়োগ পূর্বক যৌন হয়রানি এবং যৌন সহিংসতার শিকার। বিবাহ ও যৌন কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়ার কোন ন্যূনতম বাঁধাধরা বয়স না থাকার ফলে, অনেক দেশে কিশোরীরা সহযোগীদের সহিংসতার শিকার হয়। বাংলাদেশেও এ সমস্যা বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ, ...

বিশ্বব্যাপী ১ কোটি ৮০ লক্ষ কিশোরী পতিতা বৃত্তিতে লিপ্ত। এদের অধিকাংশই বিভিন্ন কারণে বাধ্য হয়ে এ কাজে লিপ্ত হয়েছে। অনেকেই পাচার হয়ে পতিতালয়ে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশেও ব্যাপকভাবে এ সমস্যা বিরাজমান। পতিতাবৃত্তিতে লিপ্ত মেয়েরা সাধারণত অযত্ন, যৌন সহিংসতা এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য: প্রতিরক্ষাহীন যৌন কার্যক্রম ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ এইডস-এর মতো দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ। তাই কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। তথ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা না দিলেও, তথ্য জানার কোন বিকল্প নাই। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং এ সম্পর্কিত ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত সীমিত।

এইচআইভি/ এইডস: ২০০৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ৪ কোটি এইচআইভি আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নারী। আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সমবয়স্ক ছেলেদের তুলনায় ১৫-২৪ বয়স্ক নারীদের এইচআইভি এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ছয়গুণ বেশি। এর একটি কারণ হলো যে, জৈবিকভাবেই যৌন কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে নারীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ। এছাড়াও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক নারীই পুরুষের চাপ প্রতিহত করতে পারে না। পুরুষদের

বহুগামিতার কারণেও নারীদের মধ্যে এইডস-এ আক্রান্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। নিরক্ষরতার কারণে নারীরা অনেক সময় এইচআইভি ঝুঁকি এবং তা থেকে প্রতিরক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন। সাব-সাহারান আফ্রিকার ২৪টি দেশের মধ্যে পরিচালিত জরিপ থেকে দেখা যায় যে, ওই অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ কিশোরীর এইচআইভি/এইডস-র সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট। বাংলাদেশে এ সমস্যা এখনো প্রকট না হলেও, আমরা বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছি ।

সারা বিশ্বে মায়েদের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-এর সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তা শিশুদের মধ্যেও দ্রুত হারে ছড়াচ্ছে। শিশুরা গর্ভকালীন, প্রসবকালীন এবং মাতৃদুগ্ধ পানের সময় এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ২০০৫ সালে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ২ লক্ষ শিশু এইচআইভি/এইডস দ্বারা আক্রান্ত হয়।

মাতৃত্ব ও বৃদ্ধকাল

মাতৃত্বকালে সময়ে ও বৃদ্ধ বয়স নারীদের জীবনে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

মাতৃমৃত্যু: প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বছরে প্রায় ৫ লক্ষ নারী – আনুমানিক প্রতি মিনিটে একজন – গর্ভজনিত জটিলতার কারণে ও প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করে। এদের ৯৯ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশের এবং ৯০ শতাংশ আফ্রিকা ও এশিয়ার নারী। ২০০০ সালের মোট মাতৃমৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ ঘটেছে ১৩টি উন্নয়নশীল দেশে। একই বছর ভারতীয় মাতৃমৃত্যুর পরিমাণ সারা পৃথিবীর মাতৃমৃত্যুর সংখ্যার আনুমানিক এক-চতুর্থাংশ। আর বাংলাদেশের এ সংখ্যা প্রতি লাখে ৩৬০ জন। শিল্পোন্নত দেশের প্রতি ৪ হাজার গর্ভবতী নারীর মধ্যে যেখানে ১ জন মৃত্যুবরণ করে, সেখানে সাব-সাহারান আফ্রিকার প্রতি ১৬ জনের মধ্যে ১ জনের এমন পরিণতি ঘটে। মাতৃহীন নবজাতকদের মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে ৩-১০ গুণ বেশি। প্রশিক্ষিত দাইয়ের সেবাসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা এবং জটিলতার ক্ষেত্রে জরুরি প্রসূতিসেবা পেলে এসকল নারীদের অনেকেরই জীবন রক্ষা করা সম্ভব হতো।

বৃদ্ধবয়সে নারী: বার্ধক্য এবং নারী হওয়ার কারণে বৃদ্ধ বয়সে নারীরা দ্বিগুণ বৈষম্যের শিকার হয়। নারীদের আয়ুস্কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়ায়, সম্পদের ওপর তাদের অধিকার না থাকায় এবং পারিবারিক উত্তরাধিকারে তাদের প্রতি বৈষম্যের কারণে বৃদ্ধ বয়সের নারীরা অনেকক্ষেত্রে, তাদের জীবনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে, আর্থিক সঙ্কটে পতিত হন। খুব কম উন্নয়নশীল দেশেই এ সকল নারীদের জন্য কোনোরূপ নিরাপত্তা কাঠামো বিরাজমান।

মাতামহরা মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য এবং যত্ন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। অনেক পরিবারে, বিশেষত যেখানে বাবা-মা উভয়ই কর্মজীবী, সেখানে দাদী-নানীরাই সাধারণত শিশুদের লালন পালন করেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, সেসকল কর্মসূচির মাধ্যমেই শিশুদের অধিকার অধিক সমুন্নত হয়, যে কর্মসূচিতে শিশু ও পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে বয়স্ক নারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এটি সুস্পষ্ট যে, জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। সকল বয়সের নারীকে এর মাশুল গুণতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে। শুধু তাই নয়, পুরো সমাজকেও এ বঞ্চনার দায়ভার বহন করতে হয়। বাংলাদেশের মতো অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশে এ পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। যেমন, নারীর প্রতি বঞ্চনার কারণে সৃষ্ট সমাজে বিরাজমান উচ্চহারের পুষ্টিহীনতা, যা উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে, আমাদের জাতীয় অগ্রগতির পথে এটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজন নারীর প্রতি বৈষম্যমার অবসান এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা। আর এজন্য প্রয়োজন আমাদের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার আমূল পরিবর্তন।

(ইউনিসেফ-এর 'দি স্টেট অফ দি ওয়াল্ড'স চিলড্রেন ২০০৭' সহায়তায় রিখিত)

কন্যাশিশু প্রসঙ্গ

বেলা নবী*

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে কন্যাশিশু দিবস পালিত হবে। কন্যাশিশু হওয়ার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে প্রকট সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের জন্য আলাদা করে দিবস ঘোষিত হয়েছে। দিবসটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে শিশুদের অধিকার আদায়ে কর্মরত বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা সমূহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে আসছে। কন্যাশিশুর অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা সভা, মতবিনিময় সভা, র‍্যালি, বিশিষ্ট লেখকদের লেখা নিয়ে প্রকাশনা বের করা, পত্র-পত্রিকায় লেখা দিয়ে এ দিবসটি উদযাপন করা হবে। সমাজ চেতনাকে জাগ্রত করতে এসকল উদ্যোগ।

* নারী নেত্রী ও পরামর্শক, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলেপমেন্ট

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। তার সঙ্গে আছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ। প্রায় ৪০ লাখ নারী পুরুষ রাজধানী ঢাকা শহরের বস্তিবাসী। এরা খেটে খাওয়া মানুষ। এ বস্তি তে তারা মানবেতর জীবন যাপন করে। এদের জীবনে চাহিদা অতি সামান্য। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তাদের সন্তানদের নিয়ে খেতে পেলেই যথেষ্ট। স্কুলে পাঠাতে পারে না এদের সন্তান-সন্ততিদের। স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। নিরাপরাধ মাতৃত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারও এসকল পরিবারে বিলাসিতা। খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা এসবই তাদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। কন্যাশিশুর জীবনেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। এরা পাচার হয়ে যায়, পতিতালয়ে বিক্রি হয় অজান্তে। এদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তবে নিরাপদ জীবনের চাহিদা আছে কিন্তু এর জন্য দাবি ওঠে না।

ঢাকা শহরে বস্তিবাসী কন্যাদের রাস্তায় ফুলের মালা, ভুট্টার খৈ, তোয়ালে, রান্না ঘরে তপ্ত হাঁড়ি ধরার জন্য 'নুসনী', অথবা ঠাণ্ডা পানি বিক্রি করতে দেখা যায়। জীবিকার তাগিদে পথে পথে হাঁটা এসকল শিশু যে যৌন হয়রানির শিকার হয় না, এমন কথা জোর গলায় বলা যাবে না। লেখাপড়ার আগ্রহ থাকলেও সুযোগ খুবই কম। ঢাকায় কয়েকটি শিশু সদন আছে। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে চলছে। সম্প্রতি কোনাবাড়িতে অবস্থিত এই পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্পর্কে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো। ঐ প্রতিবেদনটিতে যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা খুবই দুঃখজনক। প্রশাসনের দুর্বলতা, নিষ্ক্রিয়তা এসকল কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে যা কখনোই জনসাধারণের অনুমোদন পেতে পারে না। কোনাবাড়িতে অবস্থিত শিশু সনদের অব্যবস্থাপনায় শিশুরা কেমন থাকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এছাড়াও দুর্বৃত্তরা শিশু পাচার, পতিতালয়ে বিক্রির মতো হীন কাজগুলো করছে নির্দ্বিধায়।

গত ৫ মে ২০০৭ দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিলো যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলো 'Children are in hazards occupation'। সমগ্র দেশে ৭৪ লাখ শিশু শ্রমিক। এদের মধ্যে ১৩ লাখ শিশু জীবিকার তাগিদে স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ কাজে নিয়োজিত। ইউনিসেফ ও আইএলওর যৌথ জরিপেও স্বাস্থ্যের প্রতি হানিকর কাজে কর্মরত আছে এদেশের হতভাগ্য শিশুরা। তবে মজার কথা ১৯২৩ সালের Workers Compensation Act, Children Employment Act 1938, UN Convention on children's Rights (1979) সকল কিছুই জারি হয়েছে শিশুদের অধিকার রক্ষার্থে। তবে জীবনের বাস্তবতা, সরকারের অমনোযোগিতা, দুর্বলতা এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নের বিষয়টি সুদূর পরাহত। আইন অচল হয়ে পড়ে যদি না এর পেছনে চালক থাকে। সিডও সনদও শিশুর জীবন-মান উন্নয়নে যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিবারের গণ্ডির মধ্যেও যে কন্যাশিশুরা ভালো আছে তা নয়। সেখানে বাল্যবিবাহ নামক এক দানব বাস করে। এর হাত থেকে গ্রামের কন্যাশিশুরা খুব কমই রেহাই পায়। সেখানে আছে যৌন হয়রানি যা একটি শিশু মুখ ফুটে বলতে পারে না। অনেক কন্যাশিশু গৃহপরিচারিকার কাজ করে একটু ভালো থাকার জন্য। কিন্তু এদের জীবনও খুব কঠিন। পত্রপত্রিকায় এরা যে সকল নির্যাতনের শিকার প্রকাশিত হয় তা অবশ্যই ভয়াবহ। এভাবেই এরা জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আলোর সন্ধানে আঁধার হাতড়িয়ে চলছে। কোনো কূলকিনারা নেই।

শিশু অধিকার সনদ, পিআরএসপি, মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল সবই দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে। দারিদ্র্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে মানুষের মানবেতর জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এ ভোগবাদী বুর্জোয়া সমাজে শাসক, শোষক গোষ্ঠীদের জন্য কোনো জবাবদিহিতা নেই। যারাই রক্ষক তারাই ভক্ষক। এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাই সমাজের পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ টেনে আনতে চাই।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিলো। সেখানকার পত্রপত্রিকা এবং পুস্তক থেকে একজন মহান বিপ্লবী শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর নাম আন্তন মাকারেঙ্কো। সমাজতান্ত্রিক নতুন ব্যবস্থাকে বিনির্মাণ সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত করে গড়ার ক্ষেত্রে যে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের প্রতি গভীর আস্থা নিয়ে শ্রম মেধা দিয়েছিলেন তা অতুলনীয়। তাঁর কাজ ছিলো পথ শিশুদের নিয়ে। পথে ঘুরে ঘুরে এসকল শিশুদের পুনর্বাসনের অভিপ্রায়ে আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। আন্তন মাকারেঙ্কোর জন্য এ কাজটি খুব সহজ ছিল না। তবুও কখনোই হতাশ হন নি। এদের লেখাপড়া শেখানো, কারিগরি শিক্ষা, অর্থকরী কাজ শিখিয়ে স্বাবলম্বী করা, আদর্শভিত্তিক জীবনধর্ম, দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা এসকল সৎ গুণাবলী এসকল হতভাগ্য শিশুদের মধ্যে প্রথিত করতে সদাই সচেষ্ট ছিলেন। ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও বিবেক নিয়ে আন্তন মাকারেঙ্কো জয়ী হয়েছিলেন এ কঠিন সংগ্রামে। পথ শিশুদের মধ্যে যে কর্মদক্ষতা ছিলো তা বিকশিত করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক ও বন্ধু। একবার তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বিপ্লবের পর দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। তাই রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো। আন্তন তাঁর আস্তানার এক বালককে নিয়ে খাবার আনতে সরবরাহ কেন্দ্রে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে যান। তাঁর সঙ্গের ছেলেকে পাঠালেন রুটি আনতে। ছেলেটি রুটি সংগ্রহ করে গাড়িতে ফিরে এলো। আন্তনের মনে একটা খটকা লাগে, ছেলেটি মনে হয় বেশি রুটি নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে অপদস্ত করলেন না। ফিরতি পথে যেতে যেতে অনেক কথার পর ছেলেটি নিজেই স্বীকার করলো যে সে বরাদ্দ রুটির বাইরে যে একটি রুটি বেশি এনেছে।

প্রশ্ন : এ কাজটি করা কি ঠিক হয়েছে? বরাদ্দের বাইরে বেশি রুটি নেবার অধিকার তাদের নেই। সমগ্র দেশে খাদ্য সঙ্কট। এই একটি রুটি বেশি নেয়ার অর্থ হলো অন্য একজনকে বঞ্চিত করা। ছেলেটি যখন আন্তনের কথা, উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করলো তখন তারা গাড়ি ঘুরিয়ে সেই রুটি ফেরৎ দিয়ে আসে। আন্তন মাকারেঙ্কো এভাবেই পথ শিশুদের গড়ে তুলেছিলেন সাচ্চা, সৎ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি হিসেবে। পরবর্তীতে এরা চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক ইত্যাদি পেশায় যুক্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে মনোনিবেশ করেছে। যারা একদিন সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলো, বঞ্চনা ছিলো যাদের জীবনসাথী, তারাই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় নীতি ও সৎ ইচ্ছার ফলে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়।

আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার কোনো ঘাটতি নেই। কাজ করতে চাই। অবাঞ্ছিত অপাঙ্‌ক্তেয়দের জীবন আলোকিত চাই। তবে সাধ আছে, সাধ্য নেই। আসল কথা হলো, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ থাকলেই আমাদের চিন্তার সঠিক প্রতিফলন ঘটবে। সমাজ বিপ্লব ছাড়া সকল বঞ্চিত, হতদরিদ্রদের জীবনে সৌভাগ্যের স্বর্ণরেখা দেখা একটি সুদূর পরাহত এজেন্ডা হয়েই থাকবে। তাই এদেশের ক্ষণজন্মা বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন 'এ পৃথিবী শিশুর জন্য বাসযোগ্য করে যাবো, নব যাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।' এ অঙ্গীকার আজও আমাদের কানে অনুরণিত হয়, প্রেরণা জোগায় কিন্তু যথাযথ বাস্ত বায়নের পথ উন্মুক্ত হয় না। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা। আশা নিরাশার দোলাচলে আমরা এখনো জেগে আছি।

বাংলাদেশের সাঁওতাল কন্যাশিশু

ড. মোস্তাফিজুর রহমান*

মূল ধারার কন্যাশিশুদের তুলনায় সাঁওতাল কন্যাশিশুরা অনেক বেশি বঞ্চিত এবং নির্যাতিত। এক কথায়, তারা নাগরিক অধিকার থেকে প্রায় পুরোপুরি বঞ্চিত। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় যেখানে দেশের মূলধারার প্রায় ৯৩ ভাগ কন্যাশিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় সেখানে সাঁওতাল কন্যাশিশুর সংখ্যা মাত্র ২৩ শতাংশ। তাদের পশ্চাৎপদতা কেবলমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তারা শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, নিরাপদ আবাসস্থল, পুষ্টিসহ সকল ক্ষেত্রেই আজ বঞ্চিত। এছাড়া বাল্যবিবাহ, স্বল্প বয়সে মাতৃত্ব, মানসিক ও যৌন হয়রানি, অশ্লিলভাবে ঈভটিজিং, জমিতে কৃষাণী হিসেবে কাজ করানোর পর পারিশ্রমিক না দেওয়া কিংবা অল্প পারিশ্রমিক দেওয়া– প্রভৃতি বিষয়গুলো আজ তাদেরকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে। প্রতি বছর ৩০ সেপ্টেম্বর এলে আমরা কন্যাশিশুদের অধিকার নিয়ে কথা বলি, র‍্যালী করি। আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের পিছিয়ে পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করি। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবেছি, মূল ধারার কন্যাশিশুদের তুলনায় সাঁওতাল কন্যাশিশুরা অ-নে-ক অ-নে-ক পিছিয়ে আছে? তাদের জন্য কিছু করতে হবে...?

আমার গ্রামের বাড়ির পাশে একটি সাঁওতাল গ্রাম অবস্থিত। এছাড়া কিছুদিন পূর্বে পেশাগত দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত কৌতুহল থেকে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি ও নবাবগঞ্জ থানার সাঁওতাল অধ্যুষিত কয়েকটি গ্রামে গিয়েছিলাম। সরজমিনে ঘুরে যে বিষয়টি প্রথমেই আমার দৃষ্টি কেড়েছিল তা হচ্ছে অধিকার বঞ্চিত, শোষিত সাঁওতাল কন্যাশিশুরা এখনো অন্ধকারেই রয়ে গেছে। দেশের নারী সমাজ যখন শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, কন্যাশিশুরা যখন লেখা-পড়ায় এগিয়ে চলেছে এবং ছেলেদের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে ভালো ফলাফল করছে তখন সাঁওতাল পল্লীর নারী সমাজ ও কন্যাশিশুরা দু'মঠো ভাতের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি– আজ তাদের কাছে অপরিচিত ও অধরা এক শব্দ।

সাঁওতাল কন্যাশিশুর পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা। দেশে যখন সাধারণ শিক্ষার হার প্রায় ৬৬% তখন সাঁওতাল সম্প্রদায়ে মাত্র ১৭% সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষেত্রে এই হার ৭ শতাংশের সামান্য উপরে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যিমিক ও স্নাতক পর্যায়ে নারী শিক্ষার হার একেবারেই নগণ্য। আর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কোন সাঁওতাল নারী লেখাপড়া করেছে কিনা– তা আমার জানা নেই। পরিবেশগত নিরাপত্তা, সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা এবং ভাষাগত কারণে সাঁওতাল কন্যাশিশুরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে প্রচলিত সাধারণ বিদ্যালয়ে বাঙালি শিক্ষার্থীরা সাঁওতাল শিশুদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। তাদের সাথে কথা বলে না এমনকি তুচ্ছ কারণেও জাত তুলে গালি দেয় এবং মারধর করে। কন্যাশিশুরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয় তখন বাঙালি ছাত্রদের দ্বারা নানারকম মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হয়। বাঙালি ছাত্ররা তাদের কোনোভাবেই সহপাঠী হিসেবে মেনে নিতে চায় না। বন্ধুত্বের সুসম্পর্ক অথবা ভালোলাগার কথা ব্যক্ত করার পরিবর্তে তাদেরকে সরাসরি আপত্তিকর প্রস্তাব দেয়। যা কখনোই মেনে নেওয়ার নয়। এমনকি কখনো কখনো অর্থের বিনিময়ে আপত্তিকর প্রস্তাবে রাজি করানোর জন্য চলে ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ফলে বাঙালি ছাত্র এবং সাঁওতাল কন্যাশিশুর মধ্যে সহপাঠীর সহযোগী মনোভাবের পরিবর্তে বিষয়টি ভিন্নরূপ পায়। এ পর্যায়ে মেয়েটি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। ক্ষেত্রবিশেষে স্কুল ছেড়েও তারা নিস্তার পায় না। বসতবাড়িতে গিয়ে হানা দেওয়া, পথরোধ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে মেয়েটি ধর্ষিত

* গবেষক এবং প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

পর্যন্ত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের গণমাধ্যমগুলো সাঁওতালদের এসকল ঘটনাকে খুব একটি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। কেবলমাত্র তাদের মধ্যে কেউ নিহত হলে সেটিকে পত্রিকার পাতার কোনো একটি অংশে যেনতেনোভাবে প্রকাশ করে থাকে। ফলে ঘটনাটি গুরুত্বহীন ভাবেই রয়ে যায়।

সাঁওতাল সমাজের একটি সনাতন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছেলে-মেয়ে একত্রে দলবেঁধে মাঠে কাজ করা। সমাজ এগিয়ে চলেছে। সবকিছুর ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু সাঁওতাল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে নেতিবাচক। সাঁওতাল ছেলেরা এখন আর পূর্বের মত মাঠে কাজ করে না। তারা সপ্তাহে দু-একদিন রিক্সা-ভ্যান চালায়, আর বাকী সময় ঘরে শুয়ে-বসে কাটায়। কিন্তু সাঁওতাল নারী ও কন্যাশিশুরা রোদে পুড়ে এবং বৃষ্টিতে ভিজে পূর্বের মতই নিরন্তর কৃষাণীর কাজ করে চলেছে। কাজের ক্ষেত্রে নারী ও কন্যাশিশুর কদর বেশি হলেও তাদের বাজার মূল্য কম। ১১ থেকে ১৮ বছর বয়সী একটি কন্যাশিশু যে পরিশ্রম করে তা একজন পূর্ণাঙ্গ নারী কিংবা পুরুষের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। কিন্তু শ্রমের মূল্য অর্ধেক, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তা পুরুষের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগ। কন্যাশিশুর পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রেও রয়েছে বিশেষ জটিলতা। কোন কারণ ছাড়াই তাদের প্রাপ্য মজুরি দিতে গড়িমসি করা হয় এবং কোন কোন সময় এভাবে আর টাকা দেওয়া হয় না। অনেক সময় এসকল কন্যাশিশুকে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে কৌশলে শ্লীলতাহানী এমনকি ধর্ষণ পর্যন্ত করা হয়। কিন্তু সাঁওতাল কন্যাশিশু বিষয়টি চেপে যায়। যার অন্যতম উদাহরণ নিম্নরূপ:

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার আমড়াকাঠাল গ্রামের এক সাঁওতাল কন্যাশিশু (বয়স : ১৪)। ২০০৬ সালের জুন মাসে ইরি-বরো মৌসুমে কাজ শেষে পার্শ্ববর্তী গ্রামের ইসমাইল মোড়লের কাছে টাকা চাইলে ভূমি মালিক তাকে টাকা নিতে পরের দিন শেষ বিকেলে বাসায় যেতে বলে। ভূমি মালিকের কথায় সরল বিশ্বাসে কন্যাশিশুটি টাকা নিতে যায়। ইসমাইল মোড়ল তাকে অহেতুক বসিয়ে রাখে এবং সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে টাকা প্রদান করে। টাকা নিয়ে কন্যাশিশুটি বাড়ি ফেরার পথে ইসমাইল মোড়ল মাঠের মাঝে তার পথরোধ করে এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। অসুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে বিষয়টি জানানোর পর ইসমাইল মোড়ল সাঁওতাল পল্লীর মাতব্বরের মাধ্যমে চিকিৎসা বাবদ নগদ দুইশত এবং বাকী আটশত টাকার বিনিময়ে বিষয়টির রফা করে। যদিও পরবর্তীতে বাকী টাকা আর পরিশোধ করে নি। নির্যাতিত কন্যাশিশুটির বাবা জানান, তাকে এবং সাঁওতাল মাতব্বরকে ইসমাইল মোড়ল হুমকির মাধ্যমে মীমাংসা করতে বাধ্য করেছিল।

মূল শ্রোতধারার জনগোষ্ঠীদের দ্বারা নির্যাতিত এসকল কন্যাশিশু কখনোই সুবিচার পায় না। বিচারের নামে তাদের অহেতুক হয়রানি করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উল্টো তাদেরই দোষী সাব্যস্ত করে বিচারের নামে আরেকবার নির্যাতন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ২০০৪ সালের জুলাই মাসে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার বুসকি পাড়া সাঁওতাল পল্লীর এক তরুণী সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পাটক্ষেতে যায় এবং একজন স্থানীয় বাঙালি দ্বারা ধর্ষিত হন। বিষয়টি নিয়ে গ্রাম্য সালিশ বসে। সালিশে তরুণীটিকে চরিত্রহীন এমনকি গ্রাম্য পতিতা হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়। সাঁওতাল সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ করলে বিষয়টি অন্যদিকে মোড় নেয়। শেষ পর্যন্ত সালিশের রায়ে 'মেয়েকে কখন, কোথায় এবং কিভাবে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেতে হয়– এরূপ সাধারণ শিক্ষা' দিতে না পারার অজুহাতে তার বাবাকে শাস্তি স্বরূপ 'জুতা পেটা' করা হয় এবং ছেলেকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কিন্তু আজ অবধি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারটি জরিমানার টাকা পায় নি।

শুধু বাঙালি পুরুষ নয় সাঁওতাল পুরুষ এমনকি জন্মদাতা পিতা ও স্বামীর দ্বারা সাঁওতাল নারী ও কন্যাশিশুরা নিয়মিত নির্যাতিত হয়। প্রতিবেশীদের দ্বারা যৌন হয়রানি সাঁওতাল পল্লীর একটি অতি সাধারণ ঘটনা। সবচেয়ে আশ্চার্যের বিষয়, এর কোন বিচারও হয় না। সাঁওতাল মহিলাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, পূর্বে সমবয়সী কিংবা দু-চার বছরের বড়দের দ্বারা সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত এসব কন্যাশিশু নির্যাতিত হত। কিন্তু বর্তমানে বাবা, কাকা এমনকি দাদুর বয়সী পুরুষদের দ্বারাও কন্যাশিশুরা নির্যাতিত হচ্ছে, যা কন্যাশিশুর মানসিক সুস্থতাকে করছে বিঘ্নিত। মহিলারা আরো জানান, বিষয়টি নিয়ে পল্লীর কন্যাশিশুরাও সর্বদা আতঙ্কগ্রস্থ থাকে। পাশাপাশি তারা নিজেরাও ভীত থাকেন এবং নিরাপত্তার কথা ভেবে মাঠে কাজে যাওয়ার সময় তাদেরকে সাথে নিয়ে যান।

হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের উপর সাঁওতাল কন্যাশিশু ও নারীর বিন্দুমাত্র অধিকার থাকে না। পারিশ্রমিক হিসেবে পাওয়া টাকার পুরো অংশ তুলে দিতে হয় বাবা কিংবা স্বামীর হাতে। সংসারের কর্তা পুরুষটি সেই টাকা দিয়ে প্রথমে নেশা করে এবং অবশিষ্ট টাকা দিয়ে চাল-ডালসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করে। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সাঁওতাল পুরুষরা স্ত্রী-কন্যাদের নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন করে। সাঁওতাল নারীরাও এর কোন প্রতিবাদ করে না। তাদের মতে, এটি তাদের পারিবারিক সংস্কৃতিরই অংশ। কয়েকজন নারী জানান, স্বামী তাদের স্ত্রী'র উপার্জিত টাকা দিয়ে নেশা করে। ফলে বাজার করে দিতে পারে না। কিন্তু খাবার সময় হলে বাড়ি এসে খেতে চায়। খাবার দিতে না পারলেই স্বামীর হাতে নির্যাতিত হতে হয়। মাঠে কৃষাণীর কাজ শেষে বাড়ি ফিরে রান্না করতে দেরি হলে স্বামী তাদের শারীরিক নির্যাতন করে এবং কাজ থেকে ফিরতে বিলম্ব ঘটলে তাদেরকে অহেতুক সন্দেহ করে।

বাল্যবিবাহ সাঁওতাল সামাজে একটি অতি সাধারণ ঘটনা। শতকরা ৯৫ ভাগ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৪ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে। ১৫ বছর বয়সের মধ্যে যাদের বিয়ে হয় না তারা হয় দেখতে অসুন্দর, নতুবা প্রতিবন্ধী। সাধারণ অবস্থায় ১৫ বছরের পর কোন মেয়ে অবিবাহিত থাকে না। আরও ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে, এই বিয়ে শুরু হয় দশ বছর বয়স থেকে। এমনকি নারীত্ব প্রাপ্তির পূর্বেও বিয়ের ঘটনা বিরল নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক এসকল কন্যাশিশু বিয়ের পরবর্তী একবছরের মধ্যে মা হয়। তাদের জন্ম নেওয়া শিশুদের অধিকাংশই স্বল্প ওজনের এবং অপুষ্ট। সাঁওতাল সম্প্রদায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাথে খুব একটি পরিচিত নয়। তাই তারা ১৪/১৫ মাস পর পর সন্তানের জন্ম দেয়। দু-একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পাওয়া শিক্ষা থেকে তারা পদ্ধতি বলতে কেবলমাত্র 'খাবার পিলকে' বোঝে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এই কন্যাশিশুরা একের পর এক সন্তান জন্মদান কিংবা 'পিল' খেয়ে শারীরিকভাবে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হন। পাশাপাশি এই অপুষ্ট শরীর নিয়ে তাদের প্রতিদিন মাঠে কিষাণীর কাজ করতে হয়। সাঁওতাল নারীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ঋতু চলাকালে এবং গর্ভাবস্থায়ও তাদেরকে মাঠে কাজ করতে হয়। নয় মাসের গর্ভাবস্থায়ও মাঠে কাজ করার নজির সাঁওতাল পল্লীতে একেবারে বিরল ঘটনা নয়। শারীরিক সমস্যার কারণে কাজ করতে না গেলে তারা স্বামী এবং অনেক সময় বাবার দ্বারা নির্যাতিত হন। অধিকাংশ বাবা চান তার মেয়ে লেখাপড়ার পরিবর্তে মাঠে কাজ করে অর্থ উপার্জন করবে। এমনভাবে স্বামীও চায় তার স্ত্রী মাঠে কাজ করবে। বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুক প্রথার প্রচলন থাকলেও মাঠের কাজে কন্যার পারদর্শিতা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

শিক্ষা-দিক্ষায় পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের এসকল প্রান্তিক কন্যাশিশু নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। একবিংশ শতাব্দিতে এসেও দেখা যায়, সভ্যতার আলো এখনো তাদের কাছে পৌছায় নি। আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রচেষ্টায় বিশ্ব থেকে দাস প্রথার অবসান হলেও এসকল কন্যাশিশু তাদের বাবা এবং স্বামীর দ্বারা নব্য দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। নির্যাতিত এই কন্যাশিশুরা অবলা পশুর মত সকল নির্যাতন সহ্য করে চলেছেন।

দেশের সরকারি নীতি নির্ধারক, সুশীল সমাজ এবং নারী নেত্রীসহ আমাদের সকলের উচিৎ, প্রান্তিক এই কন্যাশিশুদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়া। তাদের বেঁচে থাকার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, সার্বিকভাবে শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত একক নীতির মাধ্যমে দেশের সকল সম্প্রদায়ের শিশুর উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেমনটি ঘটেছে সাঁওতালসহ অন্যান্য আদিবাসী কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে। এই কন্যাশিশুর মুক্তির জন্য সরজমিনে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নীতি প্রণয়ন করতে হবে। মুক্তি দিতে হবে তাদের নবসৃষ্ট দাসত্বের আধুনিক জিঞ্জির থেকে। আর এভাবেই সম্ভব, বাংলাদেশের সাঁওতাল কন্যাশিশুসহ অন্যান্য সকল কন্যাশিশুর অধিকার সুনিশ্চিত করা।

তথ্যসূত্র

১. ২০০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট

২. Mesbah Kamal, Dr. Muhammad Samad and Nilufar Banu, *Santal Community in Bangladesh : Problems and Prospects,* published by Research and Development Collective, Dhaka, August-2003

৩. *দৈনিক আনন্দ বাজার*, মার্চ ০৩, ২০০৭, কলকাতা, ভারত

৪. ২০০১ সালের বিভিন্ন তারিখের দৈনিক *জনকণ্ঠ*, ঢাকা, বাংলাদেশ

৫. রিসার্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ-এর *'বাংলাদেশের সাঁওতালদের সমস্যা এবং উন্নয়ন ভাবনা'* শীর্ষক গবেষণার রিপোর্ট

৬. জয়ন্ত আচার্য, *আদিবাসী জনপদের পথে প্রান্তরে*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, জুন-১৯৯৮

৭. মেসবাহ কামাল ও আরিফাতুল কিবরিয়া, বিপন্ন ভূমিজ, গবেষণা ও উন্নয়ন কালেকটিভ, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৩

৮. সঞ্জিব দ্রং, *বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০১

৯. তারপদ রায়, সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, জানুয়ারি-১৯৯৫

১০. সঞ্জিব দ্রং, *গণতন্ত্র, সুশাসন ও বাংলাদেশের আদিবাসী*, সূচীপত্র, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০০৪

১১. Mesbah Kamal, *Unbroken Silence*, Research and Development Collective, Dhaka, March-2006

১২. দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার আমড়াকাঠাল, তাঁতীপাড়া, জয়পুর ও বুড়িকাঠাল গ্রামের ৪৭ জন সাঁওতালের সাক্ষাৎকার

১৩. আলতাফ পারভেজ, প্রতিরোধ ও উন্নয়ন, নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৭

১৪. সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৫২ তম বাষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ জার্নাল *'হুল'*, প্রকাশক, বাংলাদেশ আধিবাসী অধিকার আন্দোলন, ঢাকা, জুন-২০০৭

শূন্য পাত্র হাতে বেড়ায় সে পথে পথে

রফিকুল ইসলাম সরকার*

* সাবেক মুখ্য বার্তা সম্পাদক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

সন্ধ্যার একটু আগে আমি আর হাসিনা আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফার্মগেট এলাকায়। ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করি বিপরীত দিক থেকে রাস্তা পার হয়ে একটি মেয়ে দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসেই সে হাত বাড়িয়ে বলে, "বাবা একটা ট্যাহা দ্যান - আজ সারাদিন কিচ্ছু খাইনি।"

কণ্ঠের আওয়াজ শুনে মনে হলো আমার চেনা। মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আঁৎকে উঠলাম। কি মায়ায় ভরা দু'টি চোখ। বয়স খুব বেশি হলে ১৪/১৫ হবে। মুখে একটু হাসি লেগেই আছে। অপুষ্টির চিহ্ন তার গোটা দেহে। মুখ তুলে তাকিয়ে আবার বললো, "বাবা একটা ট্যাহা দ্যান। খিদার কষ্ট বড় কষ্ট বাবা।" আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কোন মুহূর্তে আমার হাত পকেটের সব কটি টাকা তার হাতে তুলে দিয়েছে তা বুঝতেই পারি নি।

ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। হাসিনা ট্যাক্সিতে উঠার জন্য তাগিদ দিলো। উঠার আগে পকেটে হাত দিয়ে দেখি পকেটে আর একটি পঁয়সাও নেই। হাসিনাকে বলি, "ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে না।" সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম, "আমার পকেটে যা ছিল সব মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছি।" তার চোখ-মুখে ফুটে উঠলো একটু বিস্ময়ের ছাপ। কিন্তু তা খুব অল্প সময়ের জন্য। একটু পরেই সে হেসে বললো, "তোমাকে নিয়ে আর পারি না। চল হেঁটে বাড়ি ফিরি।" শুরু করলাম হাঁটা। আমরা থাকি খিলগাঁয়ের শান্তিপুরে। দু'জন হাঁটছি। ফার্মগেট থেকে সোনারগাঁও হোটেলের পাশ দিয়ে রমনা পার্কের ভিতর দিয়ে বেইলী রোড হয়ে শাহাজাহানপুর রেলগেট ক্রস করে শান্তিপুর। ঢাকা শহরে এতটা পথ আমরা দু'জনে কোনদিন একত্রে হাঁটিনি। কি অপূর্ব সে অভিজ্ঞতা। রমনা পার্কে রাতের বেলা আমরা একত্রে কোন দিন যাই নি। সকালে গিয়েছি। শত শত লোকের সঙ্গে হেঁটে স্বাস্থ্য ভাল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সন্ধ্যার পরের রমনা পার্ক সম্পূর্ণ আলাদা। লোকজন কম কিন্তু একেবারে জনশূন্য নয়। মানুষ হাঁটছে। গাছগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষগুলোকে অভ্যর্থনা জানাতে। দিনের বেলার গাছ আর রাতের বেলার গাছের মধ্যে অনেক পার্থক্য। চাঁদের আলো গাছগুলোর উপর ঠিকরে পড়ে এক অপরূপ মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

বাসায় পৌঁছা মাত্রই হামিদার কথা মনে পড়ে। হামিদা ছিল আমার ছোট বোন। আমার সব চাইতে প্রিয় মানুষ। আমি অনেক দিন বিদেশে ছিলাম। দেশে এসে আর তাকে পাই নি। অনেক কাপড়-চোপড়, হরেক রকম চকলেট তার জন্য নিয়ে এসেছিলাম। আমাদের ছেড়ে হামিদার চলে যাওয়ার খবর কেউ আমাকে দেয় নি। বাড়িতে এসে যখন শুনলাম তখন আমার সামনে সকল হাসি-কথা-গান শূন্যে মিলিয়ে গেল। বাকরুদ্ধ হয়ে কতটা সময় চলে গেছে জানি না। শুধু মনের আয়নায় ভেসে উঠছিলো আমার প্রিয় বোনটির মুখ। বারবার মনে হয়েছে একবার-শুধু একবার যদি আমার বোনটিকে দেখতে পেতাম! অ-নে-ক বছর পর আজ পড়ন্ত বিকেলে দেখা পেলাম আমার হারিয়ে যাওয়া সেই বোনটিকে। একই চোখ, একই রকম মুখ। আজ বিকেলে তাকে দেখলাম অন্যরূপে, অন্য অবয়বে। আমার প্রিয় বোনটি মিশে গেছে হাজারো লাখো দুর্গত মানুষের মাঝে। তারা যেন আমার দিকে অস্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছে, "খিদ্যার কষ্ট বড় কষ্ট- এ থেকে বাঁচার উপায় কি বলে দিন?"

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। রাত তিনটায় ঘুম ভেঙ্গে যায়। কতগুলো শব্দ আমার মাথায় আঘাত করতে থাকে। কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম:

শূন্য পাত্র হাতে বেড়ায় যে পথে পথে, ঠিক যেন আমারই ছোট ভাই, ছোট বোন
ছিন্ন বস্ত্র পড়ে যে দুঃখিনী কেঁদে ফেরে মুখটি আমারই মা'র মুখের মতন।
না খেয়ে যে ঘুম যায় বুকে নিতে মন চায়, মনে হয় সে আমারই খোকাটি তো নয়?
কোঁচকানো মুখ দেখে মনে হয় কোথা থেকে আমার দাদিটি হেথা এল পুনরায়।
সব যেন চেনা মুখ দেখলে ভরে এ বুক, পর্দা রেখেছে সব আড়াল করে
এত বাতি নিভে গেলে শূন্য এ ধরাতলে আঁধার নামবে এসে সবারই ঘরে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী হাসিনা। লেখাগুলো পড়ছে। দু'জনেই আমাদের মনের অব্যক্ত কথাগুলো তীব্র ভাবে অনুভব করলাম। একটু পরেই পাখির কিচির-মিচির কলকাকলিতে নতুন একটি ভোরের সূচনা হল। হাসিনা বললো,"দেখ ভোর হতে যাচ্ছে - এটি হবে একটি নতুন চমৎকার সকাল।"

মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু – আর সে যদি হয় কন্যা তবে?

লতিফা আকন্দ*

* অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহ-সভাপতি, জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

মানসিক প্রতিবন্ধকতা আমাদের মাঝে একটি বিশেষ নেতিবাচক অবস্থান। শুধু মানুষের নয়, প্রতিবন্ধকতা সকল জীব জগতেও বিদ্যমান। আমার আজকের লেখার উপলক্ষ আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপনের ভাবনা নিয়ে। আমরা মায়েরা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, শারীরিক, মানসিক নানা রকম পরিবর্তিত অবস্থানে নিজেকে সমর্পণ করে নির্দিষ্ট সেই প্রসবকালীন ব্যথা বেদনা উপলব্ধির অভিজ্ঞতা সয়ে একটি সন্তানের জন্ম দেই। কখনও কখনও সেই নবজাত শিশুটি স্বাভাবিক ও সুস্থ নাও হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে যে অসুস্থতা চোখে পরে, তা তার দৈহিক গঠন, অঙ্গপ্রতঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থান বা অঙ্গহানি, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি। শিশুটির মানসিক প্রতিবন্ধকতা প্রথমে ধরা পরে মায়ের কাছে, পরবর্তীতে অন্যরা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়। মা লক্ষ্য করেন শিশুটি ঠিক বয়সে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে বিকশিত হচ্ছে না। তার দৃষ্টিতে দৃষ্টি বিনিময় নেই, ভাষা নেই। বাক্য স্ফুরণও হয়তো তার বিলম্বিত, নয়তো ভাষাহীন। আবার বোধগম্যতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারে সমন্বয় নেই। অনেক ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে মোটামুটি সুস্থভাবে বেড়ে উঠলেও মানসিক বুদ্ধির উন্মেষ হয় না।

এই মানসিক ভারসাম্যহীন অসঙ্গতিকে কিছুদিন আগেও লোকে 'পাগল' বলে সম্বোধন করতো। আসলে এটি একেবারে ভুল। অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রাম বাংলার ঘরে জন্মালে তাদেরকে ওঝা, পীর বা ঐ ধরণের অনেকের অনেক ফর্মুলার অত্যাচার সহ্য করতে হতো। কেউ কেউ এতে মারাও যেত। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে উন্নত বিশ্বে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের উপর বিভিন্ন গবেষণা চলছে। এদের বুদ্ধিবিহীন বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করে, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ রাষ্ট্রীয়ভাবে বা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে এই সমস্যা চিহ্নিত হওয়ার পর একেবারে শহরকেন্দ্রিক গুটি কয়েক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিন যুগ আগে মানসিক প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে যিনি ঢাকার ইস্কাটনে প্রথম কেন্দ্রটি খুলেছিলেন ড. সুলতানা সারওয়াত আরা জমান। নরওয়ের অনুদানপুষ্ট ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় কেন্দ্রটি দ্রুতগতিতে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা লাভ করলেও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে তেমন কোন সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে নি। ড. জমান স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যার সুশিক্ষিত একটি মাকে তার সহকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এটিই ছিল আমাদের দেশে এ ধরণের প্রশিক্ষণের প্রথম পদক্ষেপ। ড. জমানের সহযোগী হিসেবে নিয়োগ পাওয়া মহিলাটি ছিল আমারই অতিপ্রিয় প্রতিবেশী মিসেস জোহরা রহমান। কয়েক বছর আগে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মানসিক প্রতিবন্ধী জগতে তিনি এক অনবদ্য অবদানের প্রতীক আছেন। ড. জমান আজও ঐ কাজে নিবেদিত প্রাণ। ড. সুলতানা জমানের প্রচেষ্টায় ১৯৮০-এর দশকে ইস্কাটন এলাকায় কল্যাণী'র সঙ্গে অনুরূপ অপর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যা, ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য, প্রতিবন্ধকতার প্রসারিত ক্ষেত্রে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দেশ বিদেশে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রটির জন্য নিজস্ব ভবন গড়ে তুলেছে। উচ্চবিত্তের বহু প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থী নানারকম দক্ষতা অর্জন করে অন্তত স্বনির্ভর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। এমনকি উৎপাদনশীল নাগরিক হয়েও উঠছে। ঢাকার বাইরে 'কল্যাণী'র বেশ কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে এর সংখ্যা একবারে নগণ্য। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা দু'টিই ব্যয় সাপেক্ষ বিধায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রসার নেহাতই কম।

বর্তমানে 'মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু' এই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়বস্তু গবেষণালব্ধ পরিসংখ্যান নির্ভর হলেও এখানে বিস্তারিত লিখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির সুযোগ নেই। তাই বিষয়টির উপর গণসচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুতে সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে, যদিও এর গুরুত্ব, প্রভাব, পরিবারে-সমাজে-রাষ্ট্রে অনেক বেশি। WHO-র হিসাবে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার দশভাগ কোন না কোন প্রতিবন্ধীতার শিকার। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩ থেকে ২৪ শতাংশই ১৫ বছরের কম বয়সী কিশোর কিশোরী। এর প্রায় অর্ধেক কন্যাশিশু। এই কন্যাশিশুর একটি অংশ আবার মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। আগেই উল্লিখিত ঢাকার ইস্কাটন এর Society For The Intellectually Disabled (SWID) Bangladesh নামটি কয়েক বছর পূর্বে ছিল Society for the CARE and education of the mentally retarded, Bangladesh প্রায় ত্রিশ বছর হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান ইস্কাটনের রাস্তার উভয় পাশে একটি কমপ্লেক্সে প্রতিবন্ধী শিশুদের (ছেলে-মেয়ে)। বর্তমানে রাজধানীর মিরপুরে আরো একটি কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। এ কমপ্লেক্সেও ছেলে-মেয়ে উভয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এরূপ আরো অনেক শিক্ষাকেন্দ্র দেশব্যাপী গড়ে ওঠা দরকার।

এখন মূল বিষয়বস্তুতে অর্থাৎ মানসিক প্রতিবন্ধী যখন কন্যাশিশু হয় তখন অবস্থা কী দাঁড়ায়– এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়। সমাজে নারী পুরুষের যে বৈষম্য সর্বত্র বিরাজমান তা প্রতিবন্ধী কন্যাসন্তানের বেলায় অনেক বেশি প্রকট ও ভয়াবহ। এ বৈষম্যের চাপ দু'রকমের। প্রথমত, কন্যা হয়ে জন্ম নেয়া তার অপরাধ, শুধু তার নয় তার বাবা মায়ের বিশেষ করে মা যেন কন্যাশিশু জন্ম দেওয়ার জন্য সেই দম্পতির অপরাধী একজন। দ্বিতীয়ত, কন্যা যদি মানসিক প্রতিবন্ধী হয়, পুরো সংসারে ভাঙ্গন ধরে ভূমিকম্পের পরের অবস্থার মত। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের সুস্থতাও বিপর্যস্ত হয়। মা এবং পরিবারকে এক ধরনের সমাজ বিবর্জিত একঘরে হতে হয়। পরিবারের অন্য সুস্থ স্বাভাবিক কন্যারও বিয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। ফলে ঐ মানসিক প্রতিবন্ধী কিশোরী কন্যাকে সবার অলক্ষ্যে বাড়ির কোনা কানিতে নিঃশব্দে একাকীত্বে যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন যাপন করতে হয়। কোন অতিথি আগন্তুকের সামনে যেন সে না আসে সেই ব্যবস্থা বা সতর্কতা অবলম্বন করে পরিবার। পরিবারের এসকল

কন্যাশিশু আমাদের ঘরে আলোকিত করে বরং অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। সে চরম উপেক্ষিত হয়। কন্যা হয়ে জন্ম নিলে পরিবারের বোঝা, আর প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিলে বোঝার উপর শাকের আঁটি।

চিকিৎসকগণ এই গোষ্ঠিকে বুদ্ধির স্বল্পতা অনুযায়ী শ্রেণি বিভাগ করে থাকেন। এক কথায়, গোটা বিভাজন Trainable (প্রশিক্ষণযোগ্য) and non-trainable (প্রশিক্ষণ অযোগ্য)। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অসমর্থ তারা অন্যের সাহায্য নির্ভর। তার সকল কাজ অপরকে করে দিতে হয়। কিন্তু যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে সমর্থ তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ বা early intervention দ্বারা আত্মনির্ভর এমনকি উৎপাদনশীল উপযোগী অনেক কাজ শেখানো সম্ভব। এরা সহায়ক পরিবেশে প্রশিক্ষণ পেলে উপার্জন পর্যন্ত করতে পারে। তাছাড়া এরা অতি নিপুণতার সঙ্গে অনুকরণে পটু। যেমন: নাচ, গান হস্তশিল্প ইত্যাদি যা শেখানো যায়। এ বিষয়ে সরকারের নীতি প্রণয়ন এবং জনগণের সহানুভূতি প্রয়োজন। একথা স্মরণযোগ্য এরাও জাতির সদস্য, সুযোগ্য নাগরিক এবং সম্ভাব্য ভোটার। সকল রকম সুযোগ পাওয়া তাদের অধিকার, করুণা নয়।

মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু সকল রকম প্রতিবন্ধকতার চেয়েও বেশি ভুক্তভোগী। আবার এরাই সবচাইতে বেশি অবহেলিত। এদের পঞ্চ ইন্দ্রীয় থেকেও নেই। কারণ তাদের নিয়ন্ত্রণের কোন মন নেই। তাদের নিজের চাহিদা বুঝার ক্ষমতাও নেই। তাদের স্বার্থরক্ষা এবং উন্নয়ন অন্য দরদী মনের উপর বর্তায়, তথা পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র। তাদের সকলের অগোচরে প্রায় সরীসৃপসম লোকচক্ষুর অন্তরালে আড়ালে আবডালে রাখা হয়। তারা শৈশব স্বপ্ন বঞ্চিত, কৈশোরেও কাটে ... এই গঠনমূলক সময়টি কন্যার বেলায় একেবারে উপেক্ষিত। তারা নিজ বুদ্ধিতে চালিত যে কোন দায়িত্ব গ্রহণে ব্যর্থ বিধায় পরিবারে লাঞ্ছিত এবং ব্যতিক্রমী শ্রেণি হয়ে বোধজ্ঞানহীন জীবন যাপন করে। সমস্যা সবচেয়ে কঠিন হয় বয়ঃসন্ধির সময়। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক পরিবর্তনে তাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। তারা কিছুই বোঝে না। ফলে তাদের নিয়ে পরিবারের দুর্ভাবনা হাজার গুণ বেশি। এদের বয়স বাড়তে থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে, বাল্য-কৈশোর-যৌবন এদের 'শরীরে' ভর করে, 'মনে' করে না। যদিও প্রকৃতির নিয়মের জৈবিক প্রয়োজন তার মধ্যেও লক্ষণীয় হয়- যেমন হয় জীব জগতের মধ্যে। এ সময় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

সাম্প্রতিককালে প্রতিবন্ধী জগৎ আমাদের দেশে কিছুটা উন্মোচিত হয়েছে। সচেতনতাও বেড়ে চলেছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাতে গোনা। তাও সরকারি খাতে বেশি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, সামগ্রিক নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার, পাচারকৃত নারী বা শিশু পুনর্বাসন, প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোকে নিয়ে বৃহৎ পরিসরে কাজ করলেও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। তারপরও বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও স্বাবলম্বী করার বিষয়গুলো নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এটিও রাজধানী ও রাজধানীর বাইরের শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের সমস্যা আরও গুরুতর হলেও এদের জন্য আলাদা কোন প্রতিষ্ঠান আজও নেই। এরা একবারে অবহেলিত। এরা বেশির ভাগ সময় বিশেষ করে পরিবারে একেবারে নির্যাতিত এবং অবহেলার জীবন্ত শিকার। ধীরে ধীরে এরা ঝরে যায় সবার অলক্ষ্যে। হাহাকার আপসোস কেউ তেমন করে না। তাদের মৃত্যু সব সময় সবার জন্য হাফ ছেড়ে বেঁচে যাওয়ার মতো। অথচ সময় মতো অর্থাৎ একেবারে বাল্যকালে তাদের স্ব স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিলে তারাও শুধু আত্মনির্ভর নয়, উপার্জনক্ষমও হতে পারে। পাশের দেশ ভারতে তাদের হাতে তৈরি জিনিস সরকার বেশি খরিদ ও বিক্রি করা দায়িত্ব মনে করে এবং সেদেশের জনগণও। আমাদের দেশে অনুরূপ পরিবেশ অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে তারা আমাদেরই একজন। যে কোন মা এ ধরনের প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু জন্ম দিতেই পারে এবং একাধিক কারণ আছে এমন শিশু জন্মাবার। বিশেষ করে আমাদের মত দরিদ্র শিক্ষাহীন সংস্কারে আবদ্ধ দেশে পুষ্টিহীনতার শিকার প্রায় সকল শিশু। কন্যাশিশু তো বৈষম্যের প্রতীক, আর সে কন্যা যদি প্রতিবন্ধী হয় তবে সে সব দিক থেকে দুর্ভাগা।

বেশ কিছুদিন আগে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর পড়ে মন ভেঙ্গে যায়। দরিদ্র বাবা অর্থ লোভে নিজের মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েকে উৎসর্গ করেছিল। ১৬ আগস্ট, ২০০৭ প্রথম আলোর আরেকটি শিরোণামে দেখে শিহরিত হতে হয়। শিরোণামটি এইরূপ "সীতাকুণ্ডে ধর্ষণের শিকার প্রতিবন্ধী কিশোরীর সন্তান প্রসবকালে মৃত্যু।" এ ধরনের ঘটনা প্রায়শ হলেও পত্রিকায় বা কোন সংবাদ মাধ্যমে তেমন প্রকাশিত হয় না। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, মানবাধিকার, তার প্রতি নিষ্ঠুরতা সামাজিক দৃষ্টিতে এবং আইনত নিকৃষ্টতম অপরাধ। নির্বোধ মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু অনেক সামাজিক ব্যাধিরও সাম্ভাব্য শিকার হতে পারে, যেমন- HIV, AIDS; মাদকাসক্তসহ আর কোনো অস্বাস্থ্যকর অপরাধে লিপ্ত হওয়া। আন্তর্জাতিক মানব উন্নয়নের সকল দলিলে এদের অধিকার উল্লিখিত আছে কিন্তু বাস্তবে প্রতিফলন নেই। আজও সেই আশির দশকের Convention on the rights of the child সংক্ষেপে CRC যেটা আমাদের রাষ্ট্র স্বাক্ষরকারী এবং পরবর্তীতে ratifyও করেছে। Convention on the Elimination of all forms Discrimination Against Women (CEDAW); আছে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন, মানব ও শিশু অধিকার সম্পর্কীয় আরও কত সংস্থা যেমন UNICEF, UNIFEM ইত্যাদি। প্রসঙ্গত আমাদের আছে সরকার ঘোষিত নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি বিরোধী আইন। কিন্তু আইনের সঠিক প্রণয়ন ও প্রয়োগের অভাবে অবস্থা রয়ে যায় কম বেশি অপরিবর্তিত। সবচেয়ে বেশি আপামর জনসাধারণের শিক্ষা, সচেতনতার চরম অভাব– তার উপর আছে লিঙ্গ বৈষম্য ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের সর্বক্ষেত্র। সার্বিকভাবে নারী নির্যাতনের রাষ্ট্রীয় আইনের দু-চারটি এখানে

উল্লেখ করা যেতে পারে। Violence against woman and children Act, The Dowry Prohibition Act, The Child Marriage Restraint Act, The Acid Crime Control Act এসকল আইন ও অধিকতর আইনের প্রয়োজনীয়তা জনগণের অজ্ঞাত। আর Disable বা প্রতিবন্ধীদের জন্য সে রকম কোন নির্ভরযোগ্য বিশেষ আইন কোথায়? প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর অবস্থান এক্ষেত্রে একেবারে অবহেলিত। এদের অভিভাবকের আইনের কাছে পৌঁছানো দুরূহ- আছে এ বিষয়ে অজ্ঞতা এবং প্রকাশে অনিচ্ছুক কারণ বহুবিধ- লজ্জা, ভয়, জন্ম দেবার অহেতুক অপরাধবোধ, অন্য সুস্থ সন্তানদের ভবিষ্যতের ভাবনা। মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু নানা ভাবে নিষ্ঠুরতার শিকার হলেও তার মর্যাদাবোধ ভীতি থেকে লজ্জা কিছুই থাকে না বলে ইয়াসমিনদের মত আত্মহত্যার চিন্তাও নেই। অবহেলায় তারা প্রায়শ ঝরে পরে। উল্লেখ্য, মানসিক প্রতিবন্ধীর অনুভূতি যে একেবারে নেই তা ঠিক নয়- যা তাবৎ জীব জগতের জন্য প্রযোজ্য। কয়েক বছর আগে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য স্পেশাল অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাতে অবস্থানকালে মাসাধিক কালব্যাপি তাদের ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তখন তাদের নানা রকম মানসিক এবং জৈবিক পিপাসা, কোমল অনুভূতি, মায়ের প্রতি টান ইত্যাদি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি খেলা শুরু হওয়ার আগে মানসিক প্রতিবন্ধী খেলোয়ারদের কৌশল হিসেবে দেশে ফোন করানো হতো। ফলে তারা অনেক পুরস্কার দেশের জন্য অর্জন করে।

এখানে দু-একটি সুপারিশ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর জন্য। এ অঙ্গনটি এতই ব্যতিক্রম যে এর জন্য ব্যতিক্রমধর্মী চিন্তা ভাবনা এবং আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার। এসকল প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনে হোস্টেল বা আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এদের প্রশিক্ষণ দিতে হলে আলাদা আধুনিক technical equipment দরকার তাদের নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সামলানো এবং বিনোদনের জন্য।

তাদের ভবিষ্যত ভাবনায় অভিভাবকদের অবর্তমানে এদের অবস্থা চিন্তা করে এক অনিশ্চয়তায় সময় কাটে। এজন্য স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে 'আইনজীবী সংঘ' বা স্থানীয় সামাজিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে কার্যকরী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে। যেন তারা তাদের অভিভাবকের অবর্তমানে বা কোন দুর্ঘটনায় তাদের সর্বত্রভাবে সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে পারে। তাদের প্রতি দরকার সংবেদনশীল সমাজ ও সচেতন মনোভাব। এমন শিশু আমার ঘরেও জন্মাতে পারতো।

শেষ কথা, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুর দৃশ্যমানতা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য সকল প্রচার মাধ্যমকে (সরকারি এবং বেসরকারি) দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজের অবাঞ্চিত এই লুক্কায়িত মানবগোষ্ঠী তার ন্যায্য অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। আমাদের ভাবতে হবে প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু আমাদের লজ্জা নয়, বোঝা নয় আমাদের অহংকারও হতে পারে।

প্রসঙ্গ কথা: কন্যাশিশু

শাওলী সুমন*

কন্যাশিশুদের অধিকারের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর একটি দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কন্যাশিশু দিবস পালন করার অর্থই হচ্ছে কন্যাশিশুদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

এ সত্য স্বীকার করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে কন্যাশিশুদের বর্তমানের চিত্র সচেতন ব্যক্তিদের জন্য উদ্বেগ-সঞ্চারী। সমাজ কাঠামোর মূলে দৃঢ়বদ্ধ মতাদর্শের (পুরুষ প্রাধান্য এবং নারীর অধস্তনতার) ফলে অধিকাংশ পরিবারে, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে কন্যাশিশুর জন্মগ্রহণকেই এক অবাঞ্চিত দুর্ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। কেবল কন্যাশিশুর জন্ম দেওয়ার কারণেই অনেক সদ্য প্রসূতি মাকে শ্বশুরবাড়িতে নিগৃহীত হতে হয়, এমনকি কখনো কখনো বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কবির ভাষায় 'জন্ম আমার আজন্ম পাপ' এদেশের অধিকাংশ কন্যাশিশুর এই কথাটি চিরন্তন সত্যে পরিণত হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে কন্যাশিশুর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজস্র ঘটনার বিবরণ দেখে শিউরে উঠতে হয়। প্রতিনিয়ত অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনই কন্যাশিশুর প্রাপ্য বলে এখনো মনে করে এদেশের সিংহভাগ লোক। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র কোন প্রতিষ্ঠানেই সে পায় না প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার। সুস্থ, নিরাপদ এবং স্বনির্ভর জীবনে উত্তরণের পথে লিঙ্গ বৈষম্য এক বিশাল প্রতিবন্ধক। কন্যাশিশুদের মধ্যেও নাজুক অবস্থায় থাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুরা।

* পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা

কন্যাশিশু ও নারীর উন্নয়ন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কন্যাশিশু চিরকালের জন্য কন্যাশিশু থাকে না। সময়ের গতিতে সে একদিন নারী হয়ে ওঠে। সমাজ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রয়োজন নারী পুরুষের সম-অধিকার ও সমান অংশগ্রহণ। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নারী আসলে মানব সম্পদ। আর কন্যাশিশু হচ্ছে মানব সম্পদের অঙ্কুর। আজ সরকারি বেসরকারিভাবে কন্যাশিশুর বিকাশ ও অধিকার সংরক্ষণের পক্ষে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত কন্যাশিশু উপযোগী সমাজ গঠন করাই হলো আমাদের জন্য আশু করণীয়। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ যে প্রত্যাশা নিয়ে কন্যাশিশু দিবস পালনের আহ্বান এসেছে তা আমাদের সকলেরই জন্য মঙ্গলকর।

কর্মজীবী মেয়েদের বাসস্থান সমস্যা

শাহ্ আব্দুল হান্নান*

আমাদের দেশে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এ কথা সত্য যে, বিশ পঁচিশ বছর পূর্বেও কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল তাতে মহিলারা সাধারণত বাড়িতে থাকত, বাইরে কাজকর্ম খুব কম করত। কিছু মহিলা শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করতেন। গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজে পড়াতেন। সংখ্যায় খুব কম হলেও কিছু মহিলা ডাক্তার ছিল, কিছু ছিল নার্সিং পেশায়। এটি অবশ্য ১৯৬০-এর আগের কথা।

পরবর্তীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে যে উন্নয়ন ঘটল তাতে নারী শিক্ষা বাড়তে লাগল এবং নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ বা বাধা ছিল তা উঠে গেল। সেটি একারণেই হলো যে নারীদের বাধা দেয়ার কোন কারণ ছিল না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন ভিত্তি পাচ্ছিল না। এ কথা সবার জানা যে, ইসলাম সকল পুরুষ ও সকল নারীর জন্য শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছে। কোরানে শুরু থেকেই 'ইকরার' উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং নারীদের শিক্ষা থেকে যে বঞ্চিত করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল না। যাই হোক পরবর্তীতে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটল। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যে সকল পরিবার বাস করতে শুরু করে তাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেল। বিভিন্ন শহরগুলোতে তাদের বাসা বাড়ি, কারোর ব্যাংকে কিছু অর্থ- এই ছিল তাদের সম্পদ। পরিস্থিতি এমন দেখা দিল যে প্রত্যেকেরই চাকরি করা দরকার। এমনও পরিবার ছিল যে শুধুমাত্র নারী নির্ভর। সেখানে তারা চাকরি না করে কি করবে? তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব কে নেবে? আজকাল যা অবস্থা, এমনভাবে সমাজটি গড়ে উঠেছে যে একজনের বেতন পর্যাপ্ত নয়। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই চাকরি করতে হয়। এই প্রেক্ষিতে, নারীর জন্য চাকরি করা জরুরি হয়ে পড়ে। এটি অনেকের ক্ষেত্রে; আমি সবার কথা বলছি না। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রাইভেট সেক্টর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলোতে নারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। সরকারি তরফ থেকেও প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

এসবের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উন্নয়ন ঘটে। সেটি হলো তৈরি পোষাক শিল্পের বিকাশ। এই বিকাশ শুরু হয় ৭৫-এর পর থেকে বা ৮০ দশকের প্রারম্ভ থেকে। পোষাক শিল্পের এই বিকাশের ফলে আজকে আমাদের দেশে কয়েক হাজার গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠেছে। সেখানে প্রায় ১৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে। যার মধ্যে ৮০% শ্রমিকই নারী।

এসকল পরিস্থিতিতে আবার অনেক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আজকে এসকল সমস্যার মধ্যে থেকে দু-একটি সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি হচ্ছে এই সকল কর্মজীবী নারীদের আবাসন সমস্যা। আমি দেখছি, চরম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে চাকরি পাওয়া এসব নারীদের অনেকেই অবিবাহিত। বিভিন্ন প্রাইভেট সেক্টর, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে প্রভৃতি কর্মক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া এসকল নারীদের পরিবার যদি ঢাকায় না থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের জন্য বাসস্থানের একটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। প্রকৃত অর্থে তাদের জন্য ভালো আবাসন ব্যবস্থা নেই। কর্মজীবী মহিলাদের একটা বড় সংগঠন আছে। ঢাকায় দু'টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলও আছে। একটি নীলক্ষেত এলাকায় এবং অন্যটি বেইলী রোডে। হয়তোবা এরকম আরো কয়েকটি হোস্টেল ঢাকা শহরে রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা একেবারেই নগণ্য। আমি দেখেছি, আমার এক নিকট আত্মীয়া একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে। তার ঢাকায় থাকার জায়গা ছিল না। আমাদের বাসায় অনেক দিন ছিল। এমএ পাশ অবিবাহিত এই মেয়েটির একটি নিরাপদ আবাসন জরুরি হয়ে পড়েছিল। অনেক কষ্টের পর আমাদের সহযোগিতায় সে একটি মহিলা হোস্টেলে সীট সংগ্রহ করে।

এরূপ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমি মনে করি, ঢাকা শহরে কর্মজীবী নারীদের আবাসন সমস্যার সমাধানে আমাদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। স্থায়ী কোন সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শহরে বসবাসকারী পরবিারগুলোকে এ ব্যাপরে এগিয়ে আসা দরকার। এ ধরনের আত্মীয়দের জন্য জায়গা দেয়া বা জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার।

---

* সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে কিছু সংখ্যক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বা দেরিতে বিয়ে হচ্ছে। আবাসন সমস্যার ক্ষেত্রে যেহেতু মেয়েদের নিরাপত্তাটিই বেশি বিঘ্নিত হয় তাই এ সমস্যটি নিয়ে আলোচনা করছি। যারা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেন তাদের দৃষ্টি এ সকল ক্ষেত্রে কতটুকু আকৃষ্ট হয়েছে আমি জানি না। তবে তাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সরকারের উচ্চ পদে কর্মরত কর্মকর্তাদেরও এক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। অনুরূপভাবে যেসকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) কাজ করছেন তাদেরও বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

দেশের বড় বড় এনজিওগুলোর এক্ষেত্রে এগিয়ে আসা দরকার। বড় বড় এনজিওগুলো প্রত্যেকে দু-একটি করে হোস্টেল তৈরি করতে পারে। তাহলেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যাবে। মেয়েদের ফ্রি রাখার দরকার নেই। ন্যূনতম খরচের বিনিময়ে তাদের থাকা-খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, সার্ভিস চার্জ যেন আমরা বাড়িয়ে না ফেলি। যদি সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি পায় তবে বিষয়টি কর্মজীবী প্রান্তিক নারীদের জন্য তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয় না।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বড় বড় ১০টি হোস্টেল গড়ে তুলতে পারে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনও কয়েকটা হোস্টেল গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি আরেকটি দিক খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যাপারটি। আমি স্বীকার করছি তাদের বেশির ভাগ বাসস্থানগুলো বস্তি এলাকায়। সেখানে হয়তোবা তারা বাবা-মা, ভাই-বোন কিংবা স্বামীর সাথে বসবাস করে। বস্তিগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। বস্তির সমস্যাগুলো আলাদাভাবে দেখা দরকার। সেখানে পানি ও গ্যাসের সুবিধার সমস্যা প্রকট। সিটি কর্পোরেশন বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে পারে।
গার্মেন্টস সেক্টরের সংগঠন বিজিএমই মনে হয় গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে মোটেও ভাবেন না। তারা চাইলে কেবলমাত্র গার্মেন্টেসে কর্মরত নারীদের জন্য কিছু সংখ্যক হোস্টেল তৈরি করতে পারেন। চাকরি ছেড়ে দিলে কিংবা চাকরি চলে গেলে তারা আর ঐ হোস্টেলে থাকবে না। থাকার জন্য পুরো খরচ তারা প্রয়োজনে বেতন থেকে কেটে নেবে। আগের মতো এখানেও স্বল্প খরচের মাধ্যমে বাসস্থান ও খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ বেতনে অনেক স্টাফ নিয়োগের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি করা চলবে না। মিনিমাম স্টাফ রেখে যত মেয়ে থাকবে তাদের খরচের মধ্যেই এটি সমন্বয় করতে হবে। পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। বিষয়টির প্রতি বিজিএমই এবং সরকারের মিনিস্ট্রি অব লেবারের নজর দেয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাগুলোর সকলে মিলে এটি করবেন। এটা করতে প্রথমে অর্থ ব্যয় হবে এরপর আর তেমন প্রয়োজন হবে না। এটি দান হিসেবে গণ্য হবে এবং বিজিএমই-এর তত্ত্বাবধায়নে পরিচালিত হবে।

কর্মজীবী মেয়েদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তার সমস্যা। নিরাপত্তার অভাবে অনেক ঘটনাই ঘটছে। বিয়ের পরের তুলনায় বিয়ের পূর্বে এরূপ ঘটনা বেশি ঘটে। তাদের শারীরিক ও যৌনভাবে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও হয়রানির ঘটনা বেশি ঘটে। বিজিএমই'র এই দিকে বড় ধরনের দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। তারা দেখেও না দেখার ভান করেন বলে মনে হয়। সরকারের নিরাপত্তা কর্মকর্তারাও যে বিষয়টি নিয়ে খুব একটা ভাবেন– সেটিও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। তা না হলে বছরের পর বছর এসকল ঘটনা কিভাবে ঘটছে? ফলে এ ব্যাপারেও বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। কর্মজীবী নারীদের বাসস্থান এবং নিরাপত্তাজনিত সমস্যার আশু সমাধান আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। সরকারের একার পক্ষে এই সমাধান কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন। তাই বিজিএমইএ, সিটি কর্পোরেশন, এনজিওসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে আজকের কন্যাশিশু আগামীর কর্মজীবী নারী। তাই এই কন্যাশিশুদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ ও কণ্টকমুক্ত করতে হলে আমাদের এখনি এগিয়ে আসতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে তাদের নিরাপদ আবাসন, সাথে সাথে সামাজিক নিরাপত্তা।

কন্যাশিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় চাই ঈভ টিজিং-এর বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ

শাহেদা ফেরদৌসী মুন্নী*

প্রেক্ষাপট

* উর্দ্ধতন কর্মসূচি কর্মকর্তা, জেন্ডার এ্যন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন সেন্টার, স্টেপস্ টুয়ার্ডস্ ডেভেলপমেন্ট

ঈভ টিজিং বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় মেয়েদের অশোভন মন্তব্য বা আচরণ দ্বারা উত্ত্যক্ত করা। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনেক সময় ঈভ টিজিংকে একটি রোমান্টিক ইমেজ দিতে সচেষ্ট থাকে এবং টিজিংকারী পুরুষদের 'রোমিও' বলে অভিহিত করা হয়। রোমান্টিকতার পর্দার আড়ালে ঈভ টিজিং-এর কুফল বা নেতিবাচক পরিণতিগুলো তাই আমাদের চোখে পড়ে না। তবে নিকট অতীতে সিমি, রুমি, তৃষা, স্বপ্না, তিথি, সোমা, রহিমা, শাকিলার মতো কয়েকটি নিষ্পাপ মেয়ের করুণ মৃত্যুর ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এর ভয়াবহতা। বস্তুত ঘরের বাইরে বের হলে তৃষা বা তিথির মতো স্কুল বালিকা, রুমির মতো কলেজ ছাত্রী বা সিমির মতো কর্মজীবী যে কোনো নারীই যে কারো দ্বারা ঈভ টিজিং-এর শিকার হতে পারে। তবে অল্পবয়সী কিশোরী বা কন্যাশিশুরাই এর শিকার হয় বেশি এবং পরিণতিতে স্কুল-কলেজ ত্যাগ, অল্প বয়সে বিয়ে, চাকরি ছেড়ে দেওয়া, ঘরবন্দী জীবন যাপন ইত্যাদি ঘটনা তাদের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে। এসকল ঘটনা তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে কিংবা জাগিয়ে তুলতে পারে আত্মহননের ইচ্ছা। প্রকারান্তরে যা নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ঈভ টিজিং-এর শিকার

যে কোনো বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থানের নারীই ঈভ টিজিং-এর শিকার হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচলিত, শালীন পোশাক কিংবা আধুনিক সাজ-পোশাকে সজ্জিতা নারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শ্রমজীবী নারী কিংবা শিক্ষিতা মার্জিত রুচিশীল নারীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। অবশ্য অল্পবয়সী স্কুল-কলেজের ছাত্রী এবং কর্মজীবী বা শ্রমজীবী নারীরা ঈভ টিজিং-এর শিকার হয় বেশি, কেননা তারা ঘরের বাইরে বেশি বের হয়। একা থাকলে তো বটেই, সঙ্গে কোনো আত্মীয়, ভাই-বন্ধু, বাবা-মা থাকলেও অনেক সময় টিজারদের কাছ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। আর অতিরিক্ত মোটা-লম্বা-পাতলা ইত্যাদি 'খুঁত' থাকলে তো কথাই নেই। অবধারিতভাবে তাকে রাস্তায় নানা 'কমেন্ট' বা মন্তব্য শুনতে শুনতে পথ চলতে হয়। ঝামেলা এড়ানোর জন্য মেয়েরা এসকল শুনেও না শোনার ভান করে তাড়াতাড়ি নিজের গন্তব্যে চলে যায়। বোরখা বা স্কার্ফও যে সকল সময় ঈভ টিজিং থেকে রক্ষা করে তা কিন্তু নয়। আগে পর্দানশীন নারী বা বয়স্কা/মুরুব্বী শ্রেণির নারীদের আলাদা এক ধরনের সম্মান করা হতো, কিন্তু এখন আর তেমনটি হয় না। আবার শুধু কিশোরী-তরুণী মেয়েরাই যে টিজিং-এর শিকার হবে– এই ধারণাও পাল্টে গেছে। ঈভ টিজারদের উপদ্রব থেকে নিস্তার নেই ৮ বছরের শিশু থেকে শুরু করে বয়স্কা মহিলাদেরও।

ঈভ টিজিং কারা করে

ঈভ টিজিং-এর কোনো বাঁধাধরা বয়স বা শ্রেণি না থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায় পুরুষ, বিশেষ করে তরুণ বয়সী ছেলেরা ঈভ টিজিং করে। উঠতি বয়সের ছেলে, স্কুল-কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে গলির মোড়ে আড্ডা দেয়া তরুণ, পাড়ার মাস্তান, রাজনৈতিক ক্যাডার, বেকার ও ভবঘুরে যুবক প্রমুখ ঈভ টিজিং করে। সাধারণ ছেলে বা ছাত্ররাও অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে নিছক মজা করার জন্য ঈভ টিজিং করতে পারে। আবার মধ্যবয়সী বা বাপের বয়সী বৃদ্ধ লোকজন টিন এজ মেয়েদের টিজ করছে এমন ঘটনা কম নয়। এছাড়া রিকশাচালক বা বাস-ট্রাক-ট্যাক্সির ড্রাইভার; শ্রমজীবী বা চাকরিজীবী সহকর্মী (বিশেষ করে গার্মেন্টস কর্মী); ফুটপাত, মার্কেট বা সাধারণ দোকানদার– এদের বিরুদ্ধেও ঈভ টিজিং-এর অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনকি সুযোগ পেলে পুলিশ-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও টিজ করতে ছাড়ে না।

ঈভ টিজিং-এর ধরন

রাস্তায় বখাটেদের টিটকারি-হয়রানি-উৎপাত তো আছেই, অনেক সময় পিছু ধাওয়া করতে করতে তারা মেয়ের বাড়িতে পর্যন্ত চড়াও হয়। এই সকল বখাটেরা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে টিজ করে বা গাড়ি নিয়ে পিছু নেয়, নির্জন রাস্তায় পেছন পেছন হাঁটে, রিকশায় জোর করে উঠে পাশে বসে বা পাশাপাশি রিকশায় কটু মন্তব্য করতে করতে যায়– এগুলো মেয়েদের নিত্য দিনের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে গেছে। টিজাররা বাড়ি বয়ে এসে মেয়ে ও তার পরিবারের সদস্যদের অপমান করছে, ভয় দেখাচ্ছে, প্রতিবাদ করলে উল্টো হুমকি-ধমকি ও পুলিশ দিয়ে হয়রানি করছে, এমনকি বাবা-মা-ভাই-বোনের সামনে থেকে মেয়েকে অপহরণ করার চেষ্টা করছে– এমনটি তো আমরা হরহামেশাই দেখছি। চলমান সামাজিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ঈভ টিজিং একটি সাধারণ সামাজিক সমস্যা থেকে ক্রমশ নারী নির্যাতনের লুক্কায়িত অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ঈভ টিজিং-এর শিকার অনেক মেয়ে প্রত্যক্ষদর্শী থেকে শুরু করে পরিবার, প্রতিবেশী এমনকি আইনের কাছেও আশ্রয় পায় না। যে কারণে বিশেষ করে কোমলমতি কিশোরী বা কন্যাশিশুরা ক্রমাগত এই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

ঈভ টিজিং-এর কারণ

উঠতি বয়সী তরুণ-যুবকরা একটু নির্দোষ মজা করার জন্যে টিজ করে থাকে– এটিই প্রধানত ঈভ টিজিং সম্পর্কে আমাদের মনোভাব। তবে ঈভ টিজিং-এর উৎসমূল সহজ সাধারণ নয়। এর বড় কারণ সম্ভবত এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এবং নারীর প্রতি প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের মন-মানসিকতা এবং সাংস্কৃতিক বোধ অনুযায়ী এ সমাজে নারী জন্মগতভাবেই পুরুষের অধস্তন। অধিকাংশ পুরুষ সেই অধস্তন নারীদের তার শাসনাধীন কর্মযন্ত্র, ভোগ বা কামনার বস্তু মনে করে এবং ভাবে যখন যেমন ইচ্ছা, তখন তেমনভাবেই নারীদের সঙ্গে ব্যবহার করা যায়। আত্মগর্বে গর্বিত এসকল পুরুষ নিজ রুচি, অবস্থা ও অবস্থানভেদে তার আধিপত্য, ক্ষমতা, শক্তিমত্তা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটায় বিভিন্ন প্রকারে। কেউ গালিগালাজ বা মানসিক নির্যাতন করে, কেউ বউ পিটিয়ে, কেউ ধর্ষণ বা যৌন হয়রানি করে, কেউ ঈভ টিজিং করে। এসকল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পারিবারিক এবং সামাজিক সমর্থন পায়।

ঈভ টিজিং বহু আগে থেকে হয়ে আসলেও এখন আমাদের দেশের মেয়েরা শিক্ষা এবং অন্যান্য কাজে ঘরের বাইরে বেশি বের হওয়ার কারণে এ নির্যাতন বেশি হচ্ছে এবং প্রকাশ পাচ্ছে। বাংলা, হিন্দী নাটক-সিনেমা-উপন্যাসে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার প্রেমের সূত্রপাত হয় ঈভ টিজিং-এর মতো ঘটনা থেকেই। পর্দায় স্বপ্নের নায়কদের এই কাণ্ডকীর্তি দেখতে দেখতে উঠতি তরুণরা নিজেদের এক একজন হিরো ভাবতে শুরু করে এবং তাদের অনুকরণে মেয়েদের পিছু নেয়া শুরু করে। আজকাল অবশ্য আর আগেকার দিনের মতো শুধু নায়িকার পিছু নেয়া বা প্রেমের সম্ভাবনার মধ্যেই ঈভ টিজিং সীমাবদ্ধ থাকছে না। গণমাধ্যমে তথা টেলিভিশন, বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে নারীর উপস্থিতি এখন অনেকটাই যৌন বস্তু (sex object) হিসেবে, ফলে নারীকে ভোগ্য বা পণ্য হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে। স্যাটেলাইট টিভির বদৌলতে হলিউড-বলিউডের খোলামেলা কাহিনী-দৃশ্য দেখে অনেকের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ঘটছে। এর অনুকরণে সবাই চটজলদি সবকিছু আশা করে। বিশেষ করে আমাদের যুবসমাজ ক্রমেই অস্বাভাবিক, অস্থির হয়ে পড়ছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন বা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতিও এই অপরাধের পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ঈভ টিজিং-এর ব্যাপকতার আর একটি কারণ হলো একে হাল্কাভাবে দেখা এবং এর দায় নারীদের উপর চাপানো। পুরুষ, এমনকি অনেক নারীর কাছেও যা নিছক মজা। একজন আত্মবোধসম্পন্ন নারীর কাছে তা নির্যাতন – এটি বোঝার জন্য যে উন্নত মানসিকতার প্রয়োজন সেটি অনেকেরই নেই। রক্ষণশীল এই সমাজে বেশির ভাগ মানুষের ধারণা মেয়েদের জায়গা ঘরে আর ছেলেদের জায়গা বাইরে। মেয়েরা তাদের গণ্ডির বাইরে এলেই বাধে অনর্থ। বলা হয়ে থাকে তারা 'অশালীন পোশাক' পরে 'আবেদনময়ী ভঙ্গিমায়' রাস্তাঘাটে চলাচল করে বলেই না ঈভ টিজিং বা হয়রানির ঘটনা ঘটে। যে পুরুষ নারীকে উত্ত্যক্ত করে বিকৃত আনন্দ পায় সমাজ তাকে মন্দ না বলে উল্টো নারীকেই হেয় করে। রাস্তায় হয়রানির প্রতিবাদ করতে গেলে দেখা যায় অনেক মানুষ জড়ো হয়ে তামাশা দেখে, কিন্তু কেউ সাধারণত প্রতিবাদী মেয়েটির পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে না। উপরন্তু মেয়েটির চরিত্র, আচার-আচরণ, পোশাক ইত্যাদি নিয়ে গালগল্প শুরু হয়ে যায়। অনেকে মনে করে ছেলেরা তো এক-আধটু দুষ্টামি করবেই, নারীদেরই বরং চলাফেরা, পোশাক-আশাক ও আচরণে সংযত হওয়া উচিত। বেশি সাহস দেখিয়ে প্রতিবাদ বা থানা-পুলিশ না করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। সমাজে এ ধরনের মন-মানসিকতা বিরাজমান বলেই প্রকৃত অপরাধী আড়ালে চলে যায়, সব দোষ গিয়ে পড়ে অপরাধের শিকার মেয়েটির উপর। আর আইনি প্রক্রিয়ায় গেলেও নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, যার চাপ নেয়া মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হয় না।

ঈভ টিজিং-এর পরিণতি

বর্তমানে ঈভ টিজিং-এর যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তাতে এটি রীতিমতো আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ঈভ টিজিং শুধু 'কমেন্ট পাস'-এর গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। এখন এর পথ ধরে যৌন হয়রানি, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, জোরপূর্বক বিয়ে, আত্মহত্যা, পরিবারের এলাকা ত্যাগ, মা-বাবা-ভাইয়ের হতাহত হওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে। সাধারণত ঈভ টিজিং-এর কারণে বড় ধরনের শারীরিক ক্ষতি না হলেও এর মানসিক ক্ষতিকর প্রভাব কিন্তু কম নয়, কারণ এটি মূলত মানসিক নির্যাতন। ঈভ টিজিং নারীর জন্য রাস্তাঘাট, পরিবার ও সমাজে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে নারীর স্বাভাবিক চলাফেরা ও জীবনযাপন ব্যাহত হয়। সারাক্ষণ একটা ভয় বা নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তার উপর বিভীষিকার মতো চেপে বসে। আক্রান্ত বা প্রকাশ্যে অপমানিত নারী তার স্বাভাবিক সম্মানবোধ হারিয়ে নিজেকে হীন ও তুচ্ছ ভাবতে থাকে। পরিণতিতে নারীর যে মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয় তার প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। দুর্নীতিপরায়ণ এবং প্রভাবশালীদের মদদপুষ্ট পুলিশের কারণে এ ব্যাপারে আইনি প্রতিকার চাইতে গিয়েও বিফল হতে হয়।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের উচ্চ হারে ড্রপ আউট বা ঝরে পড়ার পেছনে একটি বড় কারণ হচ্ছে এই ঈভ টিজিং। বখাটেদের দৌরাত্ম্যে বিশেষ করে গ্রাম বা মফস্বল অঞ্চলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে – এমন সংবাদ আমরা প্রায়ই পত্রিকায় পড়ে থাকি। এদেশে অনেক পরিবারে যেখানে মেয়েদের পড়াশোনাকেই বাহুল্য মনে করা হয় – সেখানে ঈভ টিজিং-এর হুমকির মুখে মেয়ের নিরাপত্তার জন্য বাবা-মা তার পড়াশোনা বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দেয়াটাই সহজ সমাধান মনে করেন। এভাবে অনেক সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

আইনি প্রতিকার

ঈভ টিজিংকারী অপরাধীরা আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে রেহাই পেয়ে যায় বলে ঈভ টিজিং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ঈভ টিজিং-এর বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং কঠোর আইনের কথা আমাদের জানা নেই। দেশের প্রচলিত যেসকল আইনে ঈভ টিজিং জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিচার সম্ভব সেগুলো হলো: দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (ধারা- ২৯৪ এবং ৫০৯), ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (ধারা ৭৬)। এগুলোতে নারীদের উত্ত্যক্ত করার জন্য শাস্তির বিধান আছে সর্বোচ্চ মাত্র তিন মাস বা এক বছর কারাদণ্ড কিংবা দু'হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানা আদায় না হলে কি করা হবে তার উল্লেখ নেই কোথাও। এই ন্যূনতম শাস্তির বিধান দিয়ে এ ধরনের অপরাধের প্রতিকার কতোটা সম্ভব তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া এই আইনগুলোর কথা সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, খোদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা আইনজীবীরাও অনেকে জানেন না।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এ ঈভ টিজিং-কে যৌন হয়রানির একটি ধরন হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করেছিল, যদিও 'ঈভ টিজিং' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু ২০০৩ সালে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শর্তগুলোকে শিথিল করা হয়েছে। ফলে এর আওতায় ঈভ টিজিং-এর ঘটনার আইনি প্রতিকার পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে গেছে। ২০০৩ সালের সংশোধনীতে একটি নতুন উপধারা সংযুক্ত করা হয়, যাতে কোনো নারী সম্ভ্রমহানির কারণে আত্মহত্যা করলে আত্মহত্যার প্ররোচনার দায়ে অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার বিধান করা হয়েছে। তবে এখানে সম্ভ্রমহানির কোনো সংজ্ঞা বা আওতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি। ফলে এর আওতায় ঈভ টিজিং-এর ফলে আত্মহত্যার শিকার মেয়েরা কতোটা প্রতিকার পাবে তা বোধগম্য নয়।

যা করতে হবে

- ঈভ টিজিং প্রতিরোধে প্রথমেই আমাদের এ সংক্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। অধিকাংশ মানুষই এটিকে বেশ হাল্কাভাবে দেখতে এবং ছেলেদের 'বয়সের দোষ' হিসেবে চিন্তা করতে অভ্যস্ত। এটি যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর পরিণতিতে যে নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে তা তাদের ধারণাতেই নেই। তাই ঈভ টিজিং এর কুফল সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলতে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
- ঈভ টিজিং-এর মতো অপরাধ নারী নির্যাতন দমন আইনে (২০০৩ সালে সংশোধিত) অন্তর্ভুক্ত হয় নি। অথচ গত কয়েক বছরে শুধু ঈভ টিজিং-এর শিকার হয়েই মৃত্যুবরণ বা আত্মহত্যায় বাধ্য হওয়ার কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। তাই ঈভ টিজিংকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে একে আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অথবা প্রচলিত আইনে এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঈভ টিজিং যে নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত একটি ভয়ংকর অপরাধ তা সবাইকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সুশীল সমাজকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে পাড়ার মুরুব্বী, স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও ধর্মীয় নেতা, স্কুলের শিক্ষক, গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে যেনো তারা তাদের সন্তানদের এর বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে পারেন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকরা এ বিষয়ে সচেতন হবে। উঠতি বয়সের কিশোর-তরুণদের বিশেষ প্রশিক্ষণ/কাউন্সেলিং প্রদান করতে হবে যেনো তারা ঈভ টিজিংকে একটি খারাপ কাজ হিসেবে ভাবতে শিখবে এবং ভবিষ্যতে নিজেরা এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে।
- গণমাধ্যমে ঈভ টিজিং বিষয়ে প্রচারণা এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। কেননা গণমাধ্যমের বার্তা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব ধরনের দর্শক-শ্রোতার কাছেই খুব সহজে এবং দ্রুত পৌঁছানো যায়। নারীর প্রতি সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে পুরুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন এবং সম্মানবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
- নারীদের প্রতিবাদী হতে হবে এবং এ ব্যাপারে মুখ খুলতে হবে। মেয়েরা এ ব্যাপারে সহজে মুখ খুলতে চায় না বলেই অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে পড়ে এবং অবশেষে অবস্থা যখন জটিল হয়ে যায় তখন পরিবারকে জানালেও আর করার কিছু থাকে না, উল্টো নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হয়। শুধু নিজের ব্যাপারেই নয়, চোখের সামনে অন্য কোনো মেয়েকে এরূপ ঘটনার শিকার হতে দেখলে মেয়েদের সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত। একবার মেয়েরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে শুরু করলে অপরাধীরা ভয় পাবে এবং অন্যরাও প্রতিবাদ করতে সাহস পাবে।
- নির্যাতিত মেয়েদের অধিকার রক্ষায় তৎপর ভূমিকা পালনের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষ করে পুলিশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অভ্যস্ত আর দশ জন সাধারণ মানুষের মতো পুলিশও একে নিছক মজা হিসেবে দেখে কোনো একশনে যেতে চায় না, অনেক পুলিশ এ সম্পর্কিত আইনের কথাও জানে না। তাই পুলিশ সদস্যদের জন্য বিশেষ জেন্ডার প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।
- ব্যাপক পরিসরে শিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান বা বিকল্প কর্মসংস্থান, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রদের ঝরে পড়া বা ড্রপ আউটের হার কমানোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ অশিক্ষিত, বেকার এবং অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তরুণদেরই এ ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে

পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা রোধ করতে গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানার কর্মীদের জন্য এ বিষয়ে কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শেষ কথা

সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঈভ টিজিং-এর শিকার নারীর প্রতিকার পাওয়া কষ্টসাধ্য। এ ঘটনার পর আত্মহত্যা করলেই কেবল আত্মহত্যার প্ররোচনার দায়ে দায়ী ব্যক্তিকে কঠোর সাজা দেয়া সম্ভব। কিন্তু আত্মহত্যা তো কোনো সমাধান নয়। ঈভ টিজিং-এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারলেই কেবল টিজারদের এ থেকে নিবৃত্ত করা বা নিরুৎসাহিত করা যাবে, মেয়েরাও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে এবং নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাতে পারবে। আর এটি অতি জরুরি, কেননা ঈভ টিজিং-এর কারণে নারীর নিরাপত্তা, চলাফেরা ও বিকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং নারী তার স্বাভাবিক সকল সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে প্রথাগত গৃহবধূর ভূমিকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কম ক্ষতিকর মনে হওয়া এই ঘটনাটির জন্য জাতিকে অনেক বড় মূল্য দিতে হয়।

আইন প্রণয়ন বা যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি ঈভ টিজিং-এর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ খুবই জরুরি। ঈভ টিজিংকারীদের আচরণ সংশোধন না করে যদি ঈভ টিজিং-এর শিকারদের চলাফেরা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করে ঘরে বন্দি করে রাখার চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেটি সামাজিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া হবে। আর এভাবে কখনোই এটি বন্ধ করা যাবে না। বস্তুত পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে নারীর পোশাক-আশাকের শালীনতা নিয়ে যতটা চিন্তা করতে দেখা যায় পুরুষের আধিপত্য, আগ্রাসন কিংবা লোলুপতা দমনের চেষ্টা ততোটা দেখা যায় না। এ কারণেই অপরাধীরা দ্বিগুণ উৎসাহে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায় আর নারীরা নিজেদের আরো গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। ঈভ টিজিংসহ অন্যান্য নারী নির্যাতনের জন্য একচোখাভাবে শুধু নারীকেই দোষারোপ না করে কিংবা পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও দায়ী না করে সমস্যাটির গভীরে গিয়ে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। সাধারণ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে এবং এসকল ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে প্রবল সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রতিরোধ গড়ে না উঠলে শুধু প্রচলিত আইন দিয়ে এসকল ঠেকানো যাবে না। সিমি, রুমি, তৃষা প্রমুখ তাদের জীবনের মূল্যের বিনিময়ে আমাদের সেই শিক্ষা দিয়ে গেছে।

পৃথিবীতে মানব শিশুর আগমন নিয়ে আসে অপার সম্ভাবনা আর নতুন জীবনে আলোর উদ্ভাস

সরস্বতী রানী পাল*

আমাদের সমাজে যুগে যুগে এমন অনেক মানুষ জন্মগ্রহণ করেন যাদের দেখে খুবই বিস্মিত হতে হয়। চোখ দিয়ে সুন্দর পৃথিবী দেখে নি, কান দিয়ে শুনে নি কোন বাক্য, পারে নি মুখ দিয়ে কথা বলতে। এই জগৎ তাদের কাছে অদৃশ্য, মানুষদের কথা তাদের কাছে নিঃশব্দ, বাক্যহীন, নীরব, নিস্তব্ধ। পৃথিবীতে এ ধরনের মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। কিন্তু তাই বলে তাদের কথা তুচ্ছ নয়। তারাও আমাদেরই মত একজন। শুধু এই কথাটি ভাবতে শেখা যে, তারা এই সমাজ, দেশের, পৃথিবীর মানুষ এবং তারাও বিরাট বিশ্বের একটি অংশ।

পৃথিবীতে আশ্চর্য বলে কিছু নেই

গ্রামের নাম তাসকাম্বিয়া এলএবোমা। সুদূর আমেরিকার এই গ্রামটিকে ১৮৮০ সালে জন্ম নেয় একটি কন্যাশিশু। আট দশ জন স্বাভাবিক শিশুর মতই ফুটফুটে শিশুর জন্ম হলেও মাত্র দেড় বছর সময়ের ব্যবধানে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মা-বাবা প্রাণের প্রিয় কন্যার জীবনের আশা-ভরসা ছেড়ে দেন। বহু চিকিৎসার পর জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু ভাগ্যের কি নিমর্ম পরিহাস কথা বলা, শুনা এবং দেখার শক্তি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। অন্ধকার, আলোহীন আর নিস্তব্ধ ছেয়ে যায় জীবন ও জগৎ। ফলে শিশুকালেই সেই কন্যাশিশুটি একাধারে বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা নিয়েই বড় হতে থাকে। বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হেলান কেলারের নাম আমাদের সকলেরই জানা।

হতাশ হওয়ার কিছু নেই, হেলেন কেলারের বুদ্ধিমত্তা তীক্ষ্ণ, গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে স্বাভাবিক জীবনের কাছাকাছি একটি সুন্দর জীবন ফিরে পেতে পারে– চিকিৎসকের এই কথায় পরিবারের উৎকণ্ঠা ও হতাশা কিছুটা হলে কমে যায়। শুরু হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। মাত্র আট বছর বয়সেই হেলেন কেলার হাতে আঙ্গুল দিয়ে দাগ কেটে কেটে লেখা, ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখাপড়াসহ শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ পর্যন্ত শিখে ফেলে। এতে পরিবারের লোকজন

* সহকারী প্রোগাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এবং ফিচার রাইটার

ও আত্মীয়-স্বজনেরা অবাক হয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় ছিল তার কথা শেখা। চোখে না দেখা ও কানে না শুনার দরুণ প্রথমে একটি শব্দ ব্রেইলের মাধ্যমে জানত। শিক্ষকের মুখে কম্পন, ঠোঁট ও জিহ্বার নড়াচড়া হাত দিয়ে অনুভব করে তা বুঝা ও অনুসরণ করার চেষ্টা করতো। প্রথম প্রথম যেসকল শব্দ বলত তা অদ্ভুত ধরনের একটি বিকট শব্দের মত উচ্চরিত হতো। তুবও নিরলস সাধনা করে অসাধ্যও সাধন করেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

অসাধ্যকে সাধ্য করার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্য দিয়েই হেলেন কেলার তার গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর নিজের প্রতিবন্ধকতার কথা উপলব্ধি করে তিনি সমাজের বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও গণমানুষের সহায়তা অর্জনে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাক্-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে নতুন-নতুন স্কুল এবং সমিতি গড়ে তোলেন। প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত করেন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও তিনি দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের বহু জ্ঞানী লোকের চেয়েও অধিক বেশি বই পড়েছেন। শুধু বই পড়েন নি, বই লিখেছেনও। তার রচিত বইয়ের সংখ্যা এগারো। এছাড়া তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অভিশপ্ত ও বিড়ম্বনাপূর্ণ বিষাদ জীবনের ওপর একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ এবং নিজেই সেটিতে অভিনয় করেছেন।

এই মহীয়সী নারীর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয় পৃথিবীতে আশ্চর্য বলতে কিছু নেই। তাঁর সঙ্গীত উপভোগ করার আশ্চর্য পদ্ধতি ছিলো। তিনি বাদ্যযন্ত্রের উপর হাত রেখেই বলে দিতে পারতেন তাতে কি ধরনের সুর বাজছে। হাতের স্পর্শ দিয়ে তিনি শ্রবণের কাজ করতেন আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা দ্বারা। তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যে, বহুদিনের পরিচিত মানুষের সাথে করমর্দন করে বলে দিতে পারতেন তার পরিচয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হয়েও তিনি নৌকা চালাতে পারতেন। এমন কোন বিষয় নেই যেখানে তিনি অনুপস্থিত। প্রতিবন্ধী হেলেন কেলার জয় করেছিলেন তার জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতাকে। এই মহীয়সী নারী আমাদের সকলের জন্য আশার আলো।

অতীতকে দেখা

অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে কন্যাশিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। প্রাচীন কালে এথেন্সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে মাটির পাত্রে ভরে নদীতে ফেলে দেওয়া হত। সেই সময়ে চীনেও দৃষ্টিহীন নগরের ইতিহাস থেকে জানা যায়, যেহেতু প্রতিবন্ধীরা দেশ রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবে না; তাই রাষ্ট্র তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকেই স্বীকার করত না। প্রতিবন্ধী পুত্রশিশুকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করত আর কন্যাশিশুকে বাঁচিয়ে রাখত ভবিষ্যতে মিলিটারীদের ব্যবহারের জন্য।

বর্তমানকে দেখা

অতীত ইতিহাসকে পেছনে ফেলে বর্তমানকে তুলে ধরলে দেখা যায় এখনও রয়েছে জীবনের কিছু চরম সত্যি। যা অনেক ক্ষেত্রেই কঠিন এবং অপ্রিয় বলে মনে হয়। আজকের শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেই শিশুটির সম্ভাবনার সকল দ্বার যদি উন্মুক্ত না থাকে তাহলে সে কেমন করে পারবে। এ প্রশ্ন তাড়িত করে ফিরলেও তার কোন সদুত্তর নেই। প্রতি পদেই প্রতিবন্ধীদের জন্য থাকে নানা প্রতিবন্ধকতার গল্প। তাদের কেউ কেউ পারে প্রতিবন্ধকতাকে জয় করতে আর কেউবা পশ্চাতেই রয়ে যায়। এক জীবনে তাদের পক্ষে পারাটা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

আমরা যারা স্বাভাবিকভাবে চলাফেলা করতে পারি, কথা বলতে পারি, খেলতে পারি, নিজের হাতে খেতে পারি, যারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতে পারি, তারা যেন অস্বাভাবিকদের অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের সহজভাবে নিতে পারি না। তেমন মানসিকার মাঝেই কেউ কেউ বড় হয়, বেঁচে থাকে তাদের আয়ুকাল পর্যন্ত। বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিবন্ধীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাদের কথা যত বিনয়ের সাথে বলা হয় অথবা আনুষ্ঠিকভাবে তুলে ধরা হয় ততোটা তারা বাস্তবে পায় না। ফলে সেগুলো শুধু সাজানো কিছু কথা আর অনুষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। তাদের মতে, উপেক্ষার জীবন যাদের তাদের জন্য আবার সহানুভূতি! এ যেন তাদের জন্য অবহেলারই। তবুও জীবন তো আর থেমে থাকে না তাই সময়ের সাথে তারাও উপেক্ষা, অনাদর আর অবহেলায় বেঁচে থাকে। তাতে তাদের গা সওয়া থাকে। ফলে মেনে নিয়ে মানিয়ে নিয়েই চলে জীবন। এখানে কয়েকজন প্রতিবন্ধী শিশুর জীবন বাস্তবতার কথা তুলে ধরা হলো:

- বাবা-মায়ের প্রথম ও একমাত্র সন্তান শিখা বিশ্বাস। জন্মের পর থেকে সে অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে একটু আলাদা আচরণ করত। বড় হতে হতে বুঝতে পারে সে আর সকল শিশুর মত নয়। আড়াই বছর বয়সী মেয়ে শিখা থাকে ঢাকার সেগুন বাগিচা এলাকায়। অতি আদরের কন্যা শিখা প্রসঙ্গে ওর মা জানালেন, শিখা গর্ভে থাকা অবস্থায় পেটে চাপ খেয়েছিলাম কিন্তু তখন এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। জন্মের পরও ঠিক বুঝতে পারি নি। পরে শিখা বড় হতে হতে যখন বোঝা গেল সে আর সকল শিশুর মত স্বাভাবিক নয় তখন চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে বিষয়টি অনুধাবণ করতে পারি। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।
- লালবাগ শহীদনগর এলাকার এমনই এক অবহেলিত শিশু পারভীন। ছোটবেলায় একবার খুব উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথা পায়। কিন্তু ওর মা-বাবা ভালো করে চিকিৎসা করান নি। আস্তে আস্তে সে কুঁজো হয়ে যায়। পারভীনের বয়স বাড়লেও, বাড়েনি শরীর। অর্থাৎ তার উপযুক্ত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে নি।

ওকে ছোটবেলা থেকে পুষ্টিকর খাবারও খাওয়ানো হয় নি। ফলে সে হয়ে যায় প্রতিবন্ধী। বাবা-মায়ের অসচেতনতার জন্য পারভীন আজ কষ্টকর জীবন যাপন করছে।

- অবহেলা কত যে পীড়াদায়ক কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। তেমনি একটি মেয়ে লালবাগের মৌসুমী। বয়স দশ পেরোয় নি। পিতৃহীন মৌসুমী জন্মের পর থেকে প্রতিবন্ধী। মৌসুমী হাটতে পারে না, বসতে পারে না, এমনকি কথাও বলতে পারে না। ওর এই সমস্যাগুলো জন্মের মাত্র কয়েকমাস সময়ের ব্যবধানেই বুঝতে সক্ষম হয় মা রমিসা খাতুন। সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকা মৌসুমীকে ওর মা দেখাশোনা করতে পারেন না। সার্বক্ষণিক দেখাশুনার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতিতে তা সম্ভব নয়। একমাত্র সন্তান মৌসুমীর কোন ভাই বোন নেই যে মৌসুমীকে দেখাশুনা করবে। মা মেয়ের সমস্ত কাজ করে দেয় (খাওয়া, গোসল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন)। 'ও' যে পানি চেয়ে খাবে তাও সে বলতে পারে না। মা কখন আসবে সেই অপেক্ষায় মৌসুমীর দিন কাটে। এ সময়ে তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সারক্ষণ পাশে কেউ থাকা।
- যে কাউকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করার মত কিশোরী সুবর্ণা। তার বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই সে পরিবারের নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হয়। কিন্তু বুঝে উঠার মত তার বুদ্ধি যথেষ্ট পরিপক্ক হয় নি। ফলে সুবর্ণার কাছে সবই সমান। জন্মের চার বছরের মধ্যেই জানা গেল তার রয়েছে মাঝারী মাত্রার 'বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা ও আদেশগত সমস্যা'। তাকে স্বাভাবিক স্কুলে দেয়া সম্ভব হয় নি, কারণ সে তার সুন্দর নামটি নিজের মুখে বলতে শেখে নি। 'নাম কি' জানতে চাইলে সে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারে। তার শারীরিক বৃদ্ধির সাথে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নি। সবর্ণার এই সমস্যা পরিবার প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে অবশ্য বুঝতে পারে সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রুনুর বয়স পনের অতিক্রম করায় বয়সের সাথে কিছু শারীরিক পরিবর্তন তার দৃষ্টির অগোচরে হলেও অন্যদের জন্য নয়। তাই পথে বসে ভিক্ষার পাত্রে যে যার সামর্থ্যানুযায়ী কিছু দিলেও সকলেরই চোখ থাকে সেই মেয়েটির দিকে। জন্মান্ধ রুনুর সুযোগ হয় নি এই পৃথিবীকে একটি বারের জন্য অবলোকন করার। কিন্তু সে তার অন্তর দৃষ্টিতে দেখেছে এই সমাজ ব্যবস্থার কিছু অদৃশ্য ছবি। শুনেছে কিছু অশুভ বাক্য। তবু সে ভিক্ষা করে। সকালবেলা ওর মা যখন ইট ভাঙার কাজে যায় তখন মেয়ে রুনুকে এখানে পথের এক কোণে বিপদমুক্ত করে বসিয়ে রেখে যায়। কিন্তু পথের ধারে এই মেয়েটি কতটুকু বিপদমুক্ত তা তার জানা নেই। ফেরার পথে তার মা যখন তাকে তুলে নিয়ে যায় তখন মাঝে মাঝে রুনু বলেই ফেলে পথিকদের বলা দু'একটি অযাচিত বাক্য। ওর মা ওসবে কান দেয় না। দিন শেষে কত উঠেছে এই নিয়েই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।
- যে পথ দেখায় সে থাকে সবার থেকে এগিয়ে– এই বাক্যটিই হতে পারে দু'টি সম্ভবনাময় জীবনের সম্ভবপর কিছু গল্প, আবার শেষও হয়ে যেতে পারে সময়ের অবহেলায়। শারমিন ও শামসুন্নাহার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী দুই বোন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও চোখে ওদের স্বপ্নের শেষ নেই। তারা দু'বোনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সেই লক্ষ্যে ওদের চেষ্টারও শেষ নেই। প্রাইমারির গণ্ডি পেরিয়ে এবার তারা হাই স্কুলে ভর্তি হবে। কিন্তু এজন্য সমাজ কিংবা কোনও সংস্থার দান নয়, যে সহযোগিতা প্রয়োজন তা থেকেও বঞ্চিত ওরা। শারমিন ও শামসুন্নাহারের মত অনেক প্রতিবন্ধী আছেন যাদের মনের স্বপ্ন অন্তরেই রয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠিত সত্য

একটি প্রচলিত প্রবাদ এই যে, কন্যা প্রকৃত অর্থেই পরের ধন, তাই তাকে খুব বেশি লালনের কী প্রয়োজন; যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ সে যে অপরের জীবন পূর্ণ করতে নারী হয়ে জন্ম নিয়েছে। সেদিক থেকে সুস্থ কন্যাশিশুর জীবনই যখন পরের তখন সে অস্বাভাবিক হলে জীবন চলার পথ হয়ে পড়ে অধিক কণ্টকাকীর্ণ। কোনোক্রমে তাদের জীবন নদী বয়ে চলে অযত্নে আর অবহেলায়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকুই এখনও নিশ্চিত নয়। সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক একটি শিশুর বেঁচে থাকা যে কতখানি সংগ্রাম তা কেবলমাত্র ওই সংগ্রামী শিশুটিই জানে। আর সে যদি হয় কন্যাশিশু তাহলে তো কথাই নেই!

পেছনের ইতিহাস

১৯৭৭ সালের পূর্বে 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি মানুষের কাছে অপরিচিতই ছিল। সাধারণ ভাষায় চোখে দেখতে না পেলে তাকে কানা, হাঁটতে না পারলে বা শারীরিক চলাচলে অক্ষম হলে তাকে ল্যাংড়া, কানে না শুনতে পেলে তাকে বয়রা বা কালা, কথা না বলতে পারলে তাদের বোবা বলা হত এবং তাদের দেখে উপহাস করা হতো। ১৯৭৭ সালের ২৪ ডিসেম্বর 'মানসিক কল্যাণ ও শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ 'প্রতিবন্ধী' শব্দটি সর্বপ্রথম জানতে পারে এবং ধীরে ধীরে প্রতিবন্ধী বিষয়ে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে। এরপর থেকে যারা দেখতে পারে না তাদেরকে 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী', যারা কথা বলতে পারে না তাদেরকে 'বাক্ প্রতিবন্ধী', যারা চলাচল করতে পারে না তাদেরকে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী' স্বাভাবিকভাবে বিকশিত নয় তাদেরকে 'বুদ্ধি প্রতিবন্ধী' বলা শুরু হয়।

প্রতিবন্ধীর কারণ ও ধরন

অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে অনেকে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। বাংলাদেশে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লাখ প্রতিবন্ধী আছে। তার মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। যাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে। গর্ভাবস্থায় মায়ের শারীরিক কোনও ঘাটতি, অপুষ্টি বা অসুস্থতা, পিতার ত্রুটিজনিত কারণে, জন্মের পর বেড়ে ওঠার সময় অপুষ্টি, রোগাক্রান্ত হওয়া, পোলিও, বসন্ত, টাইফয়েডের মতো সংক্রামকব্যাধি প্রতিরোধের যথাযথ ব্যবস্থা যথাসময়ে না নেওয়ায় অনেকে রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধী হয়। অপুষ্টির কারণে অনেক শিশুই অন্ধ, বোবা, পঙ্গু, রাতকানা ইত্যাদি রোগে ভোগে। যথাযথ চিকিৎসার অভাবে একটি শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া নানা দুর্ঘটনার কারণেও একজন স্বাভাবিক শিশু প্রতিবন্ধী শিশুতে পরিণত হয়।

অস্বাভাবিক শিশু যে ধরনেরই হোক না কেন তার জন্য আমাদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কিছু করার রয়েছে। শিশুর অস্বাভাবিকতাকে গ্রহণ করাই হবে বাবা-মার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বয়স বাড়ার সাথে শিশু তার অক্ষমতাকে কিভাবে গ্রহণ করবে, তার নির্ভর করে তার প্রতি বাবা-মা ও অন্যান্য পরিজনদের প্রতিক্রিয়ার ওপর। শিশুর অক্ষমতাকে এবং তার দৈহিক ও মানসিক ত্রুটিকে গ্রহণ করে অভিভাবকদের উচিত অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে পরিচালনা করা।

প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধক নয়

'প্রতিবন্ধী' শব্দটি কোনোক্রমেই করুণার নয়; কোনোক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক নয়। আমাদের সমাজে শিখা, পারভীন, মৌসুমী, সুবর্ণা, রুনু এবং শারমিনও শামসুন্নাহারের মতো হাজারও প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। প্রতি পদেই তাদের প্রতিবন্ধকতা। পরিবার থেকেই এর যাত্রা শুরু। অথচ তাদের এ অবস্থার জন্য দায়ী তো তারা নয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকুই ক্ষেত্রবিশেষ অনিশ্চিত। বিশেষত: সেই শিশুটি যদি হয় অস্বাভাবিক তাহলে তো তার প্রতিবন্ধকতার অন্ত নেই। সেক্ষেত্রে অস্বাভাবিক কন্যাশিশুর বেঁচে থাকা যে কতখানি সংগ্রাম তা কেবলমাত্র ওই সংগ্রামী শিশুটিই জানে। জন্ম থেকেই এক ধরনের অবহেলা নিয়ে সে বড় হতে থাকে।

প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতিবন্ধকতা

প্রতিবন্ধী বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নানা বৈষম্যের শিকার। বিশেষত কন্যাশিশু প্রতিবন্ধীরা এর ভুক্তভোগী বেশি। পারিবারিক বঞ্চনা থেকে শুরু করে সামাজিক হয়রানিসহ বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে থাকে এবং এটিই এক ধরনের স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে। 'প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মিতা' এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, একজন প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু যেন দুই দিক থেকেই প্রতিবন্ধকতার শিকার। একদিকে সে কন্যা অন্যদিকে সে প্রতিবন্ধী। ফলে সে চলমান সমাজ ব্যবস্থায় অনেকটা উপেক্ষায়ই সময় অতিবাহিত করে। মুখে যতটা বলা হয় বাস্তব তার ভিন্ন। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ এবং গবেষণা করে এমন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোরও রয়েছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিভিন্ন রকমের সমস্যার নানারূপ চিত্র।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর মতে, বাংলাদেশে জনসংখ্যার দশ ভাগ প্রতিবন্ধীর অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। এর মধ্যে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর সংখ্যাই ১৩ লাখ। এদের মধ্যে বিরাট একটি অংশ জুড়ে আছে শিশু। বাংলাদেশের ১৭ ভাগ শিশু দৃষ্টি, শ্রবণ, মানসিক আচরণ ও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। এই শিশুদের অর্ধেকের বেশি আবার মেয়ে।

একটি প্রতিবন্ধী শিশুর সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো সে স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। অনাদরে অবহেলায় বেড়ে ওঠা শিশুর নীরব বেদনা সবচেয়ে বেশি। বিশেষত দরিদ্র ঘরের প্রতিবন্ধী শিশুদের অবস্থা সবচেয়ে দুর্বিষহ। এছাড়া পিতা-মাতা বা অভিভাবকহীন শিশুকে বাস করতে হয় অসহায় অবস্থায়। এভাবেই আমাদের সমাজের প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে উপেক্ষার জীবন নিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশুর স্বাভাবিক জীবনের অধিকার

প্রতিবন্ধী শিশুর স্বাভাবিক জীবনের অধিকার তার জন্মগত অধিকার। প্রতিটি শিশুরই রয়েছে সমভাবে এই অধিকার। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে 'বিশেষ' সুযোগের সৃষ্টি করা এবং তাদের উপযুক্ত বিকাশের অনুকূল পরিবেশ- এ সবই শিশুর স্বাভাবিক জীবনের অধিকার।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সার্বজনীন হিসেবে সকল শিশুর কথাই বলা হয়েছে। মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ সকল শিশুর জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের ধারা-২৩ এ বলা হয়েছে, পঙ্গু বা অক্ষম শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুর সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে। সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে পঙ্গু বা অক্ষম শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিসেবা, কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং তা এমনভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপুরি সমাজ সমন্বয় অর্জিত হয়। এছাড়াও উল্লেখ রয়েছে, প্রতিষেধক স্বাস্থ্য, পরিচর্যা এবং পঙ্গু বা অক্ষম শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও ক্রিয়ামূলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ অন্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্য বিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ।

প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ, সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ প্রণীত হয়। আইনের ১৫ ধারায় প্রতিবন্ধীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলা কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলা এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সব প্রতিবন্ধীকে নিবন্ধন করবে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি নিবন্ধন বই সংরক্ষণ করবে।

সামাজিক উদ্যোগ ও বিভিন্ন কার্যক্রম

মূল স্রোতধারার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী শিশুদের সমঅধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও সমতা আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে অনেক সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। সচেতনতা বৃদ্ধি ও যোগাযোগ দক্ষতা তৈরির মাধ্যমে শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী শিশু ও তরুণদের জন্য একীভূত সমাজ তৈরিকরণের লক্ষ্যে ইশারায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা তৈরি করাসহ শিশুদের জন্য বাছাইকৃত ৫০০টি প্রাথমিক ইশারা শব্দের বুকলেট এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া উচ্চতর পর্যায়ে ৫০০টি ইশারা শব্দের বই শিশু পাঠের উপযোগী করে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো বাদেও বিভিন্ন বিনিময় কর্মশালা, প্রতিবেদন, আলোচনা পর্বে মতামত প্রকাশের সুযোগ, তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। হতে পারে তা ব্যক্তি উদ্যোগে, পরিবার বা সমাজের সচেতন নাগরিকের উদ্যোগী ভূমিকায়। শিশু বিকাশের উপযোগী করে বিভিন্ন সহায়িকা তৈরি হতে পারে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার ভিন্নতা অনুসারে প্রতিবন্ধী শিশুর ভিন্নতার উপযোগী বাক্, শ্রবণ, দৃষ্টি, শারীরিক অক্ষমদের জন্য উপযোগী শিক্ষা কার্যক্রম, ক্রীড়া, প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

সময়ের সম্ভাবনার সুযোগ

প্রতিবন্ধী শিশু জন্ম থেকেই এক ধরনের অবহেলা নিয়ে বড় হতে থাকে। বেড়ে উঠতে উঠতে যখন সে বুঝতে পারে সে অন্য সকল শিশুর মতো স্বাভাবিক নয়, তখন তার মনে প্রশ্ন জাগে- আমি এমন কেন? সহানুভূতি নয়, বরং সময়ের অপেক্ষা আর অবহেলা সেই সাথে পরিবারের বাড়তি বোঝা হয়ে সে বড় হতে থাকে। আর এভাবেই একটি অস্বাভাবিক বা প্রতিবন্ধী শিশুর জীবন নদীর বাঁক দীর্ঘতর হতে থাকে।

প্রতিবন্ধী শিশু কোনও অংশেই একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর তুলনায় কম নয়। তাদেরকে বেড়ে ওঠার অনুকুল পরিবেশ, উপযুক্ত বিকাশের পথ সৃষ্টি করা হলে তারাও হয়ে উঠবে আরও দশ জনের মত স্বাভাবিক। এজন্য প্রয়োজন একটু সহানুভূতি আর পরিবার ও সমাজের কিছু উদ্যোগ। যার ফলে ভবিষ্যতে বোঝা নয় বরং বহন করতে পারে সময়ের সম্ভাবনাময় সুযোগ।

সুযোগ পেলে সবাই পারে

সমাজের প্রয়োজনেই প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ আজকের শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ এবং সম্ভাবনার নবদ্বার উন্মোচনের স্রষ্টা। তাই প্রতিবন্ধী হওয়া যেন রোধ করা যায় সেদিকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কেউ প্রতিবন্ধী হলে তাকে সহায়তা দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা সময়ের দাবি। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারগুলো তাদেরও প্রাপ্য। তাদের প্রতি কোনোরূপ অন্যায় আচরণ বা অন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি নয় বরং সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত।

একটি সুস্থ স্বাভাবিক শিশুরই যেখানে অধিকার অনিশ্চিত, সেখানে অস্বাভাবিক শিশুর ভাবনা কিছুটা অসম্ভব মনে হয়। বিশেষতঃ সেই প্রতিবন্ধী শিশুটি যদি হয় মেয়ে তাহলে তার উপেক্ষার যেন শেষ নেই। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করার সম্ভাবনাময় উদ্যোগ আমাদেরই। সুযোগ পেলে 'প্রতিবন্ধী শিশুও পারে'– এই বাক্যটিই হতে পারে সকল শিশুর প্রতিভা বিকাশের দ্বার উন্মোচনের সফল সম্ভাবনা।

বিকশিত হওয়ার আগামী সম্ভাবনা

একটি সপ্রাণ শিশু পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করল। যেহেতু সে সজীব, সেহেতু তার প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আর প্রাণের গভীরে আত্মার অবস্থান বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সে জানে না তার এই দেহ-মন প্রাণ সমাজ কিভাবে গ্রহণ করবে। যখন সে স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ শারীরিক বা মানসিকভাবে আলাদা কোনো অস্তিত্ব ধারণ করে, তখন হয়ে পড়ে একজন প্রতিবন্ধী শিশু। বড় হতে হতে কিছু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়– 'কি হবে এই শিশুর? কবে ও কথা বলবে? ও কবে হাঁটতে পারবে? কি হবে যখন ও বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছবে? আদৌ আমার সন্তান কি স্কুলে যেতে পারবে? বিশেষ শিশুর পরিবারের ভাই-বোনদের ক্ষেত্রেও বিরাজ করে এক মৌন স্থবিরতা। নিয়ত তারা নিজেকে ছোট করে রাখে, হীনমন্যতায় ভোগে। পরিবারের সন্তানটি কোনোক্রমেই পরিপূর্ণ মানবী হতে পারবে না– এই সত্যটি মা-বাবার ব্যক্তিসত্ত্বার অহংবোধকে বিদীর্ণ করে দেয়। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়, মানসিক ও শারীরিক সমস্যার উন্নতি কিভাবে ঘটবে সেটি সম্পর্কে মা-বাবাকে সঠিক ধারণা দেওয়া যায় না। তার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব ও একেক জনের প্রতিবন্ধকতার মাত্রাও এক এক স্তরের।

নতুন জীবনে আলোর উদ্ভাসের শেষ কথা

জীবন প্রবাহে শিশু চিরন্তন মানব সন্তান। দেহ-মনে-প্রাণে আত্মায় হয় একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। শিশুর শারীরিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থান যে স্তরেরই হোক না কেন পৃথিবীতে একটি মানব শিশুর আগমন নিয়ে আসে অপার সম্ভাবনা আর নতুন জীবনে আলোর উদ্ভাস।

রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতায় পরিবার থেকেই শুরু হোক সিডও-এর বাস্তবায়ন

সালমা আলী*

সেপ্টেম্বর ৩০, 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' এবং ৩ সেপ্টেম্বর 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরোধ সনদ (সিডও) দিবস'কে স্মরণ করে বলতেই হচ্ছে যে, যতদিন দেশে সিডও- এর পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন হবে না ততদিন কন্যাদের প্রতি বৈষম্য রাষ্ট্রীয়ভাবে জিইয়ে রাখা হবে। আর যুগ যুগ ধরে পালন করে যেতে হবে 'কন্যাশিশু দিবস'। যার কোন বাস্তব তাৎপর্য থাকবে না। অধিকার সচেতন জনগণ এমনকি বঞ্চিত কন্যারাও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে না। তারা থেকে যাবে অভ্যস্ত এক গণ্ডির মধ্যে- কেননা পারিবারিক সংস্কৃতি যেখান থেকে শিশু প্রথম শিক্ষা লাভ করে, যেখানে কন্যারা জীবনেই শুরুতেই উপলব্ধি করে যে, পরিবারে তার মায়ের অবস্থান বাবার মত নয়, বোনের অবস্থান ভাইয়ের মত নয়, একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। পরবর্তীতে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ ফারাক আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়। এ অবস্থায় কন্যাদের মধ্যে জন্ম থেকেই তৈরি হয় বৈষম্যের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করার এক অভ্যস্ত গণ্ডি। ফলে তার অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও তারা এই বৈষম্যকে মেনে নেয় এবং এভাবেই যাপন করতে থাকে তাদের জীবন। অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেই শুরু হয় এবং চলতে থাকে কন্যাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের ধারাবাহিকতা।

বেশ কয়েক বছর ধরে মানবাধিকার সংগঠনগুলো জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করছে। এ প্রেক্ষিতে সংগঠনগুলোতে জেন্ডার পলিসি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হলেও এর যথার্থ অর্থ এবং উদ্দেশ্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। কেননা সমঅধিকার বিষয়টি নিয়ে এখনও জনমনে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া সম্ভব হয় নি। ফলে 'নারী ইস্যু' বা 'কন্যা দিবস' এমন বিষয়গুলো নিয়ে মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে যে, কন্যা বা নারী ইস্যুগুলোতে নারীর বিশেষ অধিকার অর্জন বা বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে। তাই সিডও-এর ধারণাও সবার কাছে স্পষ্ট নয়। ফলে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ সিডও বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করলেও এর পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তাবায়ন আজও সম্ভব হয় নি। তাছাড়া যেখানে আজ পর্যন্ত সমতার প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ সমূহই বাস্তবায়ন হয় নি বা হচ্ছে না এবং নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর জাতীয় নারী নীতি ১৯৯৭ কে থামিয়ে দিয়ে নারী পশ্চাৎপদতার নীল নকশা হিসেবে নতুন জাতীয় নারী নীতি ২০০৪ প্রবর্তন করা হয়েছে সেখানে খুব সহজে সিডও- এর পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন হবে এমন আশা দুরাশাই মনে হয়।

তবে বাংলাদেশে উন্নত দেশগুলোর অনুকরণে এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সচেতন ধর্মীয় প্রচারণার প্রভাব কিছু কিছু পরিবারে পড়তে শুরু করেছে। ফলে সংখ্যায় খুব কম হলেও বাংলাদেশে সচেতন কিছু পরিবারের মধ্যে সমতা বিষয়টির বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। যেমন- শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ের মধ্যে কোন বৈষম্য না করে সমপর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা দেয়ার মানসিকতা তৈরি এবং বাস্তবায়ন হচ্ছে, মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পত্তিতে কন্যাদের পাওনা ২:১ অর্থাৎ পুত্রের অর্ধেক হলেও অনেক পরিবারেই পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সম্পত্তির সমান বিতরণ হচ্ছে। তবে যেহেতু দেশে বিভিন্ন ধর্মের জন্য বিভিন্ন আইন বিদ্যমান রয়েছে সেহেতু উত্তরাধিকার বিষয়টিতে সমতা অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ একটি বিষয় হয়ে রয়েছে। যেমন- নারীর প্রতি সর্বাধিক বৈষম্য রয়েছে হিন্দু ধর্মে সেখানে নারী উত্তরাধিকারসহ সকল ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আসছে সবসময়ে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ আইনের পরিবর্তন হয়ে নারী উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছে এমনটি মনে হলেও সেখানেও নতুন আইন বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে না। এসকল কিছুর প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্ট যে, যে কোন জাতীয় আইন বা আন্তর্জাতিক আইন সংশোধন, পরিবর্তন বা প্রণয়ন যত সহজ বাস্তবায়ন ততটা সহজ নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভারতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি মাত্র বোন এবং দু'ভাইয়ের পরিবার। বাবা-মা দু'জনই মৃত কিন্তু মৃত্যুকালে তারা রেখে গেছেন অগাধ সম্পত্তি। এক পর্যায়ে ভাইরা তাদের বোনটির খুব ধুমধাম করে বিয়ে দিলেন। এলাকার লোক প্রত্যেকে বাহবা দিল বোনের প্রতি ভাইদের দায়িত্ববোধে এবং তা পালনের জন্য। কিন্তু তারা কেউ জানলো না যে, ভারতের সনাতন প্রথা অনুযায়ী, তারা বোনকে পণ দিয়ে বিয়ে দিল কিন্তু প্রবর্তিত নতুন আইন অনুযায়ী সম্পত্তির যে প্রাপ্য তা থেকে বোনটিকে বঞ্চিত করলো। এ ধরণের অনেক ঘটনা বাংলাদেশে হরহামেশাই ঘটছে। তাই সমতার প্রশ্নে সমতার বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এমন পরিবারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে পরিবার থেকেই বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব এমনটি আশা করা যেতে পারে। যদিও এটি অত্যন্ত সত্য যে, পরিবার থেকেই বৈষম্যের শুরু। পরিবারের মধ্যেই যেহেতু শুরু হয়েছে এর নিরসন তাই বর্তমান পরিবর্তিত উক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবারই হতে পারে কন্যাদের প্রতি বৈষম্য নিরসনসহ সিডও বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা আজ যে সকল অজুহাত সিডও-এর পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের পক্ষে

---

* মানবাধিকার নেত্রী এবং নির্বাহি পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি

প্রতিবন্ধকতা হয়ে রয়েছে পরিবারের ক্ষেত্রে সে সকল অজুহাত কখনও উত্থাপিত হবে না যদি সে পরিবারটির সকলেই নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে বা সমতায় প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী হয়। আর সেটিই জরুরি, কেননা আজ ২৫ বছর পূর্তি এ সময়েও রাষ্ট্র থেকে তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি তাই পরিবারই হতে পারে বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমতা বাস্তবায়নের প্রথম এবং প্রধান ক্ষেত্র। তবে এজন্য সংস্কৃতি পরিবর্তনের যে শুরু তা করতে হবে পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র পর্যায়ে। সর্বস্তরের পারিবারিক পর্যায়ে এটি শুরু হলে হয়তো রাষ্ট্রীয়ভাবে সিডও-এর পূর্ণ অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যবাধকতা তেমন অসাধ্য হবে না। তাই আসুন, রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতায় পরিবার থেকেই শুরু করি সিডও-এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম ।

সিডও কমিটির ২৫ বছর ও বাংলাদেশ

সুলতানা কামাল*

সিডও (এসইডিএডব্লিউ-নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সনদ) কমিটি ২৫ বছর পূর্ণ করল। ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রগুলো সিডও বাস্তবায়নে কোন অবস্থানে আছে তার পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ কাজটি তারা করে রাষ্ট্রগুলো বাধ্যতামূলকভাবে যে পিরিয়ডিক প্রতিবেদন দাখিল করে তার মাধ্যমে। প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে কমিটি তাদের সমাপনী মন্তব্য দিয়ে যেসকল রাষ্ট্র সিডওর পূর্নাঙ্গ বাস্তবায়ন করছে না বা করতে পারছে না তাদের যথাযথ নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

এ কথা গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে, সিডও কমিটিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এই কমিটি এমন একটি কমিটি, যেখানে পৃথিবীর সকল সদস্যরাষ্ট্রের মধ্য থেকে সদস্য নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশ থেকে সালমা খান (যিনি বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত) সিডওর চেয়ার পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের ফেরদাউস আরা বেগম সদস্যপদে আসীন আছেন। আমি তাঁদের কমিটির ২৫ বছর পূর্তিতে অভিনন্দন জানাই। তাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কমিটিকেও আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পৌঁছে দিতে চাই।

এবার আসি বাংলাদেশে সিডও-এর বাস্তবায়ন প্রশ্নে। সিডও সনদ আমরা পাই ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব রকম বৈষম্য দূরীকরণের একটি দলিল হিসেবে। ১৯৮১ সালে সিডও কার্যকর হতে শুরু করে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে সিডওতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু ধারা ২ ও ১৬-এর তিনটি উপধারায় আপত্তি দিয়ে পূর্ণ অনুসমর্থন করা থেকে বিরত থাকে। ১৯৯৭ সালে ১৬-র দুটি ধারায় আপত্তি তুলে নিলে বর্তমানে শুধু ২ ও ৬ (১) (গ)-তে আপত্তি বহাল থেকে গেছে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সিডও কমিটির কাছে পাঁচটি পিরিয়ডিক প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশকে ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে স্পষ্ট ভাষায় সিডওর পূর্ণ বাস্তবায়নের চিত্র তুলে ধরতে হবে। এবং এবারের প্রতিবেদনে পঞ্চম প্রতিবেদন সম্পর্কে সিডও কমিটি যে মন্তব্য দিয়েছে তার সদুত্তর থাকতে হবে। তাই কাজটি সরল হলেও সহজ নয়। এখানেই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতের কথা প্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবে না এবং এই মর্মে জাতীয় আইন পরিবর্তিত হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করতে এত সময়, এত কৈফিয়ত, এত অজুহাতের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো তা হচ্ছে, আমরা নারী-আন্দোলনের পক্ষে সেই সূচনাকাল থেকেই সরকার পরম্পরায় সিডও-এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, মতামতের জরিপ এবং যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তা চিহ্নিত করে দেওয়ার কাজগুলোও সমাধা করার যথাসাধ্য উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতিটি সরকারি পিরিয়ডিক প্রতিবেদনের পাশাপাশি ছায়া প্রতিবেদনও তৈরি করেছি এবং সিডও কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত থেকে তা উপস্থাপন করেছি। একটি সময় এ বিষয়ে সরকারের অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি উদ্যম ছিল, যার মাধ্যমে নারী অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করা যেত। নিকট-অতীতে সেটিও আর হচ্ছে না। আমরা সবাই বুঝতে পারি এটি রাজনৈতিক সদিচ্ছার বিষয়।

খুবই অধুনা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নতুনভাবে আবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট নারী অধিকার সংগঠন ও ব্যক্তিদের সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম পিরিয়ডিকাল প্রতিবেদনটি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তৈরি করার জন্য। সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা ও কর্মকর্তারা এজন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত সভার শুরুতে যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল, সিডও কমিটির ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সে কথাটি নিয়ে একটু এগিয়ে যেতে চাই।

---

* তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, মানবাধিকার নেত্রী

কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল এভাবে যে, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের নারীদের মন্ত্রণালয় হোক এবং এই মন্ত্রণালয়ের কণ্ঠই বাংলাদেশের নারীদের কণ্ঠ হোক। সে অনুযায়ী এই মন্ত্রণালয় যেন নারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি যথাযথভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরে। এ জন্য প্রয়োজন নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও নারী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা।

এ কথার সূত্র ধরেই বলি, আমরা চাই প্রতিটি মন্ত্রণালয় যেন সত্যিকার অর্থে যাদের জন্য মন্ত্রণালয় তাদেরই হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে বলতে চাই, পাট মন্ত্রণালয় যেন পাটচাষিদেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, শ্রম মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিত্ব করে শ্রমিকদের, শিক্ষকেরা দেখতে পান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাঁদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। মন্ত্রণালয়গুলো যেন হয়ে ওঠে সরকারের মধ্যে জনগণের প্রতিনিধি– জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতিভূ নয়। এতদিন ধরে, দুঃখজনক হলেও সত্য, মন্ত্রণালয়গুলো যেন কিছু গোষ্ঠী, কিছু মানুষের স্বার্থ উদ্ধারের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নীতি নির্ধারিত হয়েছে কিন্তু যাঁদের জন্য নীতি নির্ধারিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার কোনো সুযোগ থেকেছে এমনটি দেখা যায় নি। নীতি নির্ধারণ নানা বিবেচনা অথবা বাধ্যবাধকতায় হয়ে থাকে, সে কথা সবারই জানা। তারপরও কোনো গৃহীত নীতির কারণে যদি সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ওপর কোনো রকম নেতিবাচক প্রভাব আসে, সে বিষয়ে কোনো আগাম সতর্কতা বা ব্যবস্থাপনার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মন্ত্রণালয়গুলোর কাজ করার কথা ছিল জনগণ যে ভিত্তিতে তাদের ম্যান্ডেট দিয়েছিল তার সঙ্গে সংগতি রেখে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা চলে গেছে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ ভাবধারার শ্রেণি, গোষ্ঠী, দল অথবা ব্যক্তির সুবিধায়। নারী নীতি বদলিয়ে ফেলা হয়েছে সমতার দাবি উপেক্ষা করে, পাটকলের পর পাটকল বন্ধ হয়ে গেছে শ্রমিকের রুটি-রুজির ব্যবস্থা না করে, শিক্ষাঙ্গণ ব্যবহৃত হয়েছে দলের সমর্থকের পেশি শক্তিশালী করতে, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পদ বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিয়েছে শিল্পপতির, অথচ একটির পর একটি দরিদ্র মানুষের জন্য তৈরি প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেছে।

এভাবে প্রতিটা মন্ত্রণালয় ধরে হাজারটা উদাহরণ তুলে ধরা যায়। আজ রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যম ও উদ্যোগে এদিকটায় দৃষ্টি দিতে ভুলে গেলে সরকারের বড় একটা কার্যকারিতা থেকেই জাতি বঞ্চিত হবে এবং বর্তমান সরকার তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এ ধরনের উদাহরণ রেখে যেতে পারে। সিডও বিশেষভাবে নারীদের প্রতি সব রকম বৈষম্য বিলাপের সনদ বটে, তবে এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের অঙ্গীকার। আজকের দিনে প্রার্থনা, সেই অঙ্গীকার শক্তিশালী ও বাস্তবায়িত হোক সবার সম্মিলিত উদ্যোগে।

সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭

মেয়ে শিশু যখন শাশুড়ি হয়

সেলিনা হোসেন*

জন্মের পর থেকেই সমাজের নির্যাতিত অংশ হয়েও মেয়েদের মনে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা কাজ করে। যে কারণে সে সংসারে পুত্রের উপর নির্ভর করে তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন চায়। পুত্রের মাধ্যমে সংসারের বৈষয়িক দিকটি রক্ষিত হয় বলে মেয়েরা তাকেই অবলম্বন মনে করেন। কারণ, বিবাহিত জীবনে নারী সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে প্রবলভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। সে জানে পুত্র তাকে পরিবার ও সমাজে মর্যাদার আসনে আসীন করবে, কন্যা নয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কারণে পিতৃপরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয় পিতা থেকে পুত্রের উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় এবং স্বামীর পারিবারিক পরিচয়ে স্ত্রীকে পরিচিত হতে হয় ও স্বামী গৃহে বাস করতে হয়। স্বামী গৃহে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সে বধূ থেকে মাতা, মাতা থেকে শাশুড়ি এবং শাশুড়ি থেকে পিতামহীরূপে আস্তে আস্তে মর্যাদার আসন লাভ করে। একটি সংসারে কর্তৃত্ব পাওয়ার পর থেকেই তার মনে প্রাধান্য বিস্তারের প্রবণতা আসে। সংসারের মানুষগুলো হয় ওঠে তার প্রজা। ছেলে এবং মেয়ের বিয়ে দিলে এই প্রজার সংখ্যা বাড়ে। মেয়ের জামাইকে শাশুড়ি তোয়াজ করে, কারণ মেয়ের ভবিষ্যৎ সেই ছেলেটির হাতে। অন্যদিকে পুত্রবধূকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার বাসনা থেকে শুরু হয় তার ওপর কর্তৃত্ব। যে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে আসে সে একটি নিরহ প্রাণী হিসেবে শাশুড়ির কাছে প্রতিভাত হয়। শাশুড়ি পরিবারের সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ভুলে যায় যে সে নিজেও এই সমাজের নির্যাতিত অংশের একজন। জন্মের পর থেকে সে নিজেই নির্যাতনের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়ে এসেছে।

পুত্রকে দিয়ে বংশ রক্ষা হয় বলে শাশুড়ি পুত্রবধূর সতীত্বের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। পুত্র লম্পট হলেও ক্ষতি নেই। বরং মা তাকে প্রশ্রয় দেয়।

---

* লেখক ও কথা সাহিত্যিক

যৌতুকের দাবি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাশুড়িই উত্থাপন করে। এমন অনেক নজীর আছে যে যৌতুক দিতে না পারার কারণে শাশুড়ির হাতে নির্যাতিত হয়েছে পুত্রবধূ। এমনকি প্রবল নির্যাতনের কারণে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে।

বিয়ের দুই-তিন বৎসরের মধ্যে পুত্রবধূর সন্তান না হলে শাশুড়িই প্রথমে তার বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। ছেলেও যে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হতে পারে এ চিন্তা তার কাছে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব পায় না। পুত্রবধূর অক্ষমতার অজুহাতে শাশুড়ি পুত্রের দ্বিতীয় বিয়ের আয়োজন করে। পুত্র অক্ষম হলে সেক্ষেত্রে সংসারে দেখা দেয় অশান্তি। তাই দেখা যায় মেয়ে-শিশু যখন শাশুড়ি হয় তখন আর সে মেয়ে থাকে না।

একটি দৃষ্টান্ত

মাদারিপুর জেলার কালকিনি উপজেলার সালাম ও রেবা। রেবা আমার আত্মীয়। বিয়ের পাঁচ বছর পরও তাদের কোন সন্তান হয় নি। শাশুড়ি ছেলেকে আবার বিয়ে দেওয়ার জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করে। রেবা ঢাকায় এসে আমাকে এ কথা জানায়। আমি সালামকে বলি বিয়ে তুমি একটি কেন, আরও তিনটে করতে পারো। এ অধিকার তোমার আছে। তবে তুমি যদি সন্তানের জন্য বিয়ে করতে চাও তাহলে তোমাদের দু'জনেরই ডাক্তারী পরীক্ষা করা দরকার। আমি তোমাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাই। সালাম রাজি হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় ধরা পরে সালামের নিজের দোষ। 'ও' কোন দিনই বাবা হতে পারবে না। সেই ঘটনার পর সালাম আর কোন দিনই আমাদের সামনে আসে নি। তবে 'ও' আর বিয়েও করে নি।
ডাক্তারি পরীক্ষার এই সুযোগ বাংলাদেশের খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই বা হয়? পুরুষ প্রাধান্যের কারণে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় মেয়েরা– অনেক সময় বিনা অপরাধে। এসকল ক্ষেত্রে শাশুড়িরা যদি অন্ধকারে না থেকে নিজের উদ্যোগে ছেলে এবং পুত্রবধূর ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করে তাহলেই মেয়েরা সুবিচার পাবে। অন্যায়ভাবে স্বামীর দোষ সারাজীবন নিজের ঘাড়ে বহন করবে না।

শাশুড়িরা যদি নিজের শৈশব এবং কৈশোরের কথা বিবেচনা করে তার ঘরের মেয়েদের সাথে মানবিক আচরণ করে তাহলে সমস্যা অনেক সহজ হয় এবং পারিবারিক ভারসাম্যে ভাঙ্গন ধরে না। পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান যে কত দুর্বল– এটাই বেরিয়ে আসে ননদ-ভাবি সম্পর্ক থেকে।

পারিবারিক সম্পর্কগুলো আসলে একটি ধারাবাহিক ব্যাপার। শাশুড়ি যা পেয়ে আসছে সে চায় বউটির উপর তারই প্রতিফলন ঘটাতে। যা আমি পাই নি তা আমার বউকেও পেতে দেবো না– এমন একটি মনোভাব শাশুড়ির ভেতর কাজ করে আর ননদটিও তার মায়ের কাছে এই আচরণগুলো শিখে থাকে। এটি কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগ। এটা আসলে ক্ষমতায়নেরও ব্যাপার।

পরিবারের মহিলা প্রধানের ঈর্ষা কাজ করে পরিবারের পুত্রবধূটির উপর। তারা নিজেদের ক্ষমতা হারানোর ভয়ে সতর্ক থাকে। ননদটি ভাবে জন্ম থেকেই সে এই পরিবারের একজন। ভাবি হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো একটি জায়গা দখল করে নিল। ননদ এটি নিয়ে ঈর্ষান্বিত হয়। যদি ভাবি পরিবারে ভালভাবে গ্রহণীয় হয়, তাহলে সে ভাবে তার অবস্থানটি শক্ত মাটি পাবে না। তার ভবিষ্যৎ সে অন্ধকার দেখে। কেননা পরবর্তীতে সেও অন্য একটি পরিবারে যাবে। সেখানে তার অবস্থানটি ভাল হবে কী না এই আশঙ্কা তার মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে। সেই অনিশ্চয়তার ক্ষোভ থেকে ভাবির সঙ্গে সে ভাল আচরণ করে না। এখানে অর্থনৈতিক সমস্যা প্রধান হয় না। সামাজিক কোন কারণও বড় নয়। এটি একটি কমপ্লেক্স বলা যায়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলেই এই সম্পর্কগুলো পুরুষকে কেন্দ্র করে চালিত হয়। যেমন এই সমাজে ছেলের বউকে ভালভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকে না শাশুড়ির, কিন্তু মেয়ে জামাইকে তোয়াজ করার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ তার মেয়েটিকে যেন জামাই ভাল রাখে। এই দুই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের একমাত্র কারণ– এই সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে একজন পুরুষ। অনেক পরিবারে দেখা যায়, ননদটি ভাবির পক্ষে কথা বলে। ভাইকে বকা দেয়, মাকে বোঝায়। এখনকার অবস্থা অনেক ভাল বলেই মনে হয়। এখন ননদ ভাবির সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। ১০/১৫ বছর আগেও এটি বেশ খারাপ ছিল। উচ্চবিত্ত পরিবারে এটি তেমন সমস্যা সৃষ্টি করে না। দেখা যায় মধ্যবিত্ত পরিবারেই সমস্যাটা বেশি প্রকট।

আসলে এগুলো সবই আর্থ সামাজিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে ঘটছে। শুধু আমাদের সংস্কৃতিতেই এমন, আমি বিদেশি একটি পরিবারে দেখেছি একটি বাঙালি মেয়েকে পুত্রবধূ হিসেবে তারা কী সম্মানটাই না করে! তারা ছেলেটির ছোটবেলার খেলার জিনিস, ছবি, ব্যবহার্য অন্য অনেক কিছু জমিয়ে রেখেছিল তার পুত্রবধূকে দেখানোর জন্য। তারা ছেলের বউকে কোন ভাবেই আলাদা করে দেখে না। তাদের ভালবাসা তাদের সবকিছু বউটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যেটি ছেলের স্বস্তির জন্যই

একান্ত জরুরি। এই যে একটি অনুভূতি – এটি থাকাই কিন্তু স্বাভাবিক। আমরা আমাদের নব্বই ভাগ পরিবারে এটি দেখি না। মেয়েরা স্বাবলম্বী হলে এসকল সমস্যা থাকবে না। শিক্ষা, চিন্তা, সামাজিক সুস্থতা একটি মেয়েকে মূলত সচেতন করে তোলে এসকল ব্যাপারে। মেয়েদের অধিকারের স্বীকৃতিগুলো যখন আদায় হবে তখন এই সম্পর্কের টানা পোড়েনগুলোও অন্যরূপ নেবে। সব শাশুড়ি, ননদ যদি কাজের মধ্যে থাকে, বাইরের পৃথিবীতে তার বিচরণ যদি সাবলীল হয় তাহলে সে ঘরে এমনিতেই আর সমস্যা হবে না। সমস্যা তৈরি করার সময়ই পাবে না।

এগুলো অনেকটা পারিবারিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে গড়ে ওঠে। যে মেয়েটি মাকে দেখে অন্য বাড়ির মেয়েকে ভালবাসতে, সে মেয়েটি নিজেও শিখে ফেলে তার করণীয় আচরণটি। অথবা যে বউটি নিজের পরিবারে দেখে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত, সেই মেয়েটি অন্য পরিবারেও এর চর্চা করবে– এটাই স্বাভাবিক।

গৃহপালিত কন্যাশিশুদের কথা

ড. হালিমা খাতুন*

একটু দুঃখ করেই গৃহপালিত শব্দটা ব্যবহার করছি। তা সবাই বুঝতে পারছেন। শহরের প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে এদের অবস্থান। পুত্র শিশুও আছে তবে তাদের সংখ্যা কম। তাদের অবস্থা আর কন্যাশিশুদের অবস্থা একই রকম দুঃখময়। গৃহকর্মের জাহাজটিকে সব দিক দিয়ে সচল রাখার জন্য এই কন্যা বাহিনীর প্রয়োজন। আর্থিক দিক দিয়ে যারা উপরের সিঁড়িতে তাদের জাহাজে এই কন্যা নাবিকের সংখ্যা একাধিক। যাদের ঘরে এই কন্যাটি নেই তাদের হাহাকারের অন্ত নেই। বর্তমানে পোষাক শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রাথমিক শিক্ষার বদৌলতে সর্বজনীন সমতা বিতরণের ফলে কন্যাশিশুর ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, তাই সরবরাহ বেশ সঙ্কটজনক অবস্থায়। কন্যাশিশুদের উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশের গ্রামগুলো সেখানে সবই আছে, কেবল খাবার নেই। তাই পেটের দায়ে এই শিশুরা শ্রম বিক্রয়ের জন্য শহরের ঘরে ঘরে আসতে বাধ্য হয়।

সোনার বাংলার গ্রামগুলো এখন নকল সোনায় গড়া। সেই গ্রামের সন্তানদের জন্য বহুকাল আগে ঈশ্বরী পাটনী দেবী দূর্গার কাছ থেকে দুধ ভাতের ইজারা নিয়েছিলেন। দুধ দুঃস্বপ্ন, আর ভাত কল্পনা মাত্র। মোটের উপর অভাবের কারণে শহরের দিকে কাজের মেয়েরা আসে ও ক্রীতদাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়। সকল সংস্থার কর্মচারিদের সাপ্তাহিক ছুটি আছে, নির্ধারিত কর্মসময় আছে, কিন্তু গৃহ পরিচারিকাদের নেই। শীতকাল হোক আর গ্রীস্ম-বর্ষা হোক বারোটি মাস সূর্য ওঠার আগে তাদের উঠতে হবে এবং সংসারের পাথর ভাঙ্গার কাজ শুরু করতে হবে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে। একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই, অসুখ হলেও নয়। যখন কাজে নিয়োগ করা হয় তখন বলা হয়, বেশি কোন কাজ না, এই কাপড় ধোঁয়া, বাসন মাজা, ঘরদোর পরিস্কার করা, মেয়েটিকে একটু রাখা, দরকার মতো মশলা বাটা আর টুকটাক রান্না করা, যখন যেটি সামনে পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ছোট্ট তালিকাটি ক্রমে ফুলে ফেঁপে কি বিস্তৃতি লাভ করে কন্যাশিশু শ্রমিকরা তা ভালো করে জানে। এটা যেসকল বাড়ির ধারা বিবরণ তা কিন্তু নয়, তবে প্রায় নিরানব্বই পারসেন্ট ঘরের এটি দীর্ঘশ্বাস। তারপরেও গৃহকর্ত্রী সন্তুষ্ট নন, গৃহকর্তাও অকথ্য বাক্যবাণ সংযত করতে পারেন না। পুত্র কন্যাগণও মানবাধিকারের নীতি ভুলে দানব অধিকারের প্রবক্তা হয়ে ওঠে এবং হতভাগিনীদের ভাগ্যে যা জোটে তার সচিত্র বর্ণনা খবরের কাগজের দেহসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে অহরহ। এসকল ক্ষেত্রে সংসারের কর্ত্রীই প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে দূর দ্বীপবাসিনী মেয়েটিকে সৎকার শালায় পাঠান। এক বছরের বা তার কম সময়ের খবরের কাগজের পাতা কেটে স্ক্রাপবুক তৈরি করলে এসব খবরের একটি দীর্ঘকায় পুস্তক হয়ে যাবে।

গৃহপালিতাদের খাদ্য বিতরণ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করা হয়, তাদের পুষ্টি যেনো না হয় সেদিকে গৃহিনীর সজাগ দৃষ্টি থাকে সার্চলাইটের মতো। এমনকি ফেলে দেওয়া খাদ্যাংশও তাদের পাতে জোটে না। কোন সুখাদ্য যদি কখনও তাদের ভাগ্যে জোটে তার পরিমাণ বা পরিমিতি মাপও খুব স্পেশাল জ্যামিতিক বা গাণিতিক পরিমাপক দরকার। তাই বলছিলাম গৃহপালিত কন্যা পরিচারিকার মেদ বৃদ্ধি যাতে না হয় তার জন্য গৃহব্যবস্থাপক অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে তা পরিবীক্ষণ করেন। অথচ প্রতিবেশী বা আত্মীয়দের সঙ্গে কথোপকথনে নিজ উদার হৃদয়ের তালিকা সাড়ম্বরে প্রকাশ করেন এবং কন্যাটি বা কন্যাগুলোর বদস্বভাব বা বদনামের ডালি উজাড় করে শ্রোতার মনোহরণ করেন। কন্যাটি বা কন্যাগুলোর স্বভাবে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তারা কোনোদিন বিদ্যালয়ের ধারে পাশে যায় নি, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজতো দূরের কথা। তার মা বাবা ও চৌদ্দপুরুষ নিরক্ষর ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গরিষ্ঠদের অন্যতম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পেটের দায়ে তারা শহরে কাজ করতে আসতে বাধ্য হয়। তাছাড়া রিক্রুটিং এজেন্ট সাপ্লাইয়াররাও অনেক রঙ্গীন স্বপ্নের বর্ণিল চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরেন। তাই তারা পতঙ্গের মতো ছুটে আসে অগ্নিবন্যার গৃহকর্মের

* অধ্যাপক (অব.), ----------বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অমোঘ আকর্ষণে। এই কন্যাগুলোর চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে প্রবলভাবে। দেশে যদিও বেকারত্বের হার সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। শহরের বাসিন্দার সংখ্যাও সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। শহরে থেকে নিজেরা কাজ করা শোভা পায় না, তাই দরকার সার্বক্ষণিক গৃহসেবিকা। তাদের শোওয়ার সময় হয় ঘড়ির কাটার বারোটা বেজে গেলে। এটি হলো সাধারণ নিয়ম। এখন কিন্তু আধুনিক গৃহবাসীরা নিশাচর হয়ে গেছে, তাদের দিন রাতের ঘড়ি অন্যরকম, অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল বাড়িতে সন্ধ্যাই হয় রাত বারোটার পরে, কাজেই সবকিছু সামাল দেওয়ার জন্য গৃহকর্মীদের সেই রুটিনের সাথে ক্রুশিফাইড হতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে নেমে আসে আঘাত ও অপঘাতের বন্যা। প্রায় সকল গৃহে এটি প্রযোজ্য যার বিবরণ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতা বিষণ্ন করে তোলে। তবুও এরা আসে আর রূপ দেয় শক্তিধর গৃহবাসীদের রোষানলে ।

অনেক সামাজিক মানবিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে। গৃহকর্মীদের নিয়ে বড় রকমের বা ছোট মাপের কোনও গবেষণা হয়েছে কিনা আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনে হয় এ ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দিক দিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। এই প্রকট অমানবিক সমস্যার একটি নীতি সঙ্গত সুরাহা হওয়া দরকার।

গৃহকর্মীরা মানুষ এবং অভাবী মানুষ। তাদের কর্মসংস্থান দরকার। এজন্য তাদের গৃহকর্মে প্রশিক্ষণ দেওয়া, এদের নিরাপত্তা, কর্মসময়, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও যাবতীয় মানবিক প্রয়োজন যাতে মেটে তার ব্যবস্থা করা দরকার। জনসাধারণের মধ্য থেকে মানবদরদী স্বচ্ছল ব্যক্তিরা যদি এগিয়ে এসে এই কন্যাশিশুদের প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং সরকারও যদি এ ব্যাপারে তৎপর হন তাহলে মনে হয় গৃহকাজের জন্য নিয়োজিত কন্যাশিশুদের নিশ্চিত ভবিষ্যতের একটি ঠিকানা পাওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে সকল সংসারের প্রয়োজনও মানবিক উপায়ে মেটাবার একটা পথ পাওয়া যাবে। আমার এই প্রস্তাব অনেকের কাছে দুর্বল মনে হলেও চিন্তা করার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।